কেশরঞ্জনের মধুর স্মৃতি।

সুন্দরী বলেন—"কেশরঞ্জন না হইলে চুল বাঁধিব না।" সুন্দর যুবক বলেন,—"কেশরঞ্জন না মাখিলে আমার চুল খারাপ হইয়া যাইবে।" যিনি মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন, তিনি বলেন,—"মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে কেশরঞ্জন চাই।" "কেশরঞ্জনের" কথা এখন সকলেরই মুখে। কেন বলুন দেখি? কারণ—"কেশরঞ্জন" ভেষজ-গুণান্বিত মস্তিষ্ক-শীতলকারী মহাসুগন্ধি কেশ তৈল। ইহা কেশবৃদ্ধি করিতে, কেশ সুচিক্কণ করিতে, কেশ-মূলের শিথিলতার নিবৃত্তি করিতে অদ্বিতীয়।

একশিশি ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।৵৹ আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কবিরাজ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

প্রথম কল্প] [১ম খণ্ড

অর্ঘ্য

আশ্বিন, ১৩২১] [September, 1914

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন-সম্পাদিত।

কার্য্যালয়—৩ নং ভৈরব বিশ্বাসের লেন, কলিকাতা।

ভারতলক্ষ্মী প্রভিডেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড্

হেড আফিস—৮১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাসিক চাঁদা এক টাকা মাত্র দিয়া জীবন ও বিবাহ বীমা হয়। ১০ বা ১৫ বৎসর পরে টাকা পাওয়া যায়। বিবাহ বীমাতে প্রদত্ত চাঁদার দ্বিগুণ টাকা দেওয়া হয়। ইহা পলিশিতে লেখা আছে।

রিজার্ভ ফণ্ড—১,৫৫,০০০৲ টাকার বেশী। ইহার মধ্যে ১,০০,০০০৲ টাকার গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিস্ আছে। সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক—বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস—সি, সি, মজুমদার এণ্ড সন্স।

যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী ও উৎকৃষ্ট রবারষ্ট্যাম্প আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সচিত্র মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

ম্যানেজার,—কারমাইকেল রবারষ্ট্যাম্প ওয়ার্কস্

১৭৯, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্ঘ্য

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুলসহ

এক টাকা মাত্র।

দি হিমালয়া এসিওরেন্স্

কোং লিমিটেড।

হেড আফিস ঃ—১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাত।

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী পেপার আছে।

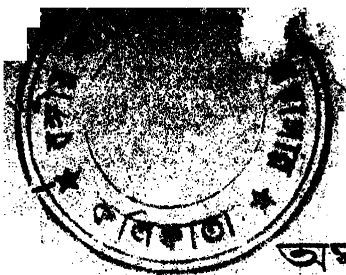
জীবন বীমায় মাসিক চাঁদা ১৲, ৷৹, এবং বিবাহ বীমায় ২৲, ১৲, ও ৷৹ মাত্র। ৬ মাস পরে মৃত্যু বা বিবাহ ঘটিলে শ্রাদ্ধ বা বিবাহের ১৫ দিন পূর্ব্বে দাবীর টাকা মিটাইয়া দেওয়া হয়।

এই কোম্পানীর দাবীর টাকা নির্দ্দিষ্ট ও পলিসিতে লেখা আছে। দাবীর পরিমাণ এরূপ পলিসিতে লেখা অন্য কোন কোম্পানীতে নাই—পরীক্ষা করুন।

সহর ও মফঃস্বলের সর্ব্বত্র বহু বিশ্বস্ত, কর্ম্মদক্ষ এজেণ্ট আবশ্যক। কমিশনের হার সর্ব্বোচ্চ।

বিশেষ বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্য সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

জি. বি. নিরো এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্।





অর্ঘ্য।

৫ম কল্প | আশ্বিন, ১৩২১ | ১ম খণ্ড

রঙ্গালয়-প্রসঙ্গ।

মহাকবি সেক্ষপীয়র যখন অভিনেতা ও নাট্যকাররূপে প্রভূত যশোলাভ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সম-সাময়িক অন্যান্য অভিনেতা ও নাট্যকারগণ বহুবিধ প্রকারে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে বিরত হন নাই। এই সকল আক্রমণের প্রধান হেতু প্রতিদ্বন্দ্বিতাজনিত বিদ্বেষ। গ্রীন্ নামক নাট্যকার সেক্ষপীয়রের পূর্ব্বে যশস্বী ছিলেন। নবীন লেখক ও অভিনেতা সেক্ষপীয়রের অভ্যুদয়ে তাঁহার যশোদীপ্তি ম্লান হইয়া পড়িল। সাধারণ দর্শকেও সেক্ষপীয়রের অকুণ্ঠিত প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন বিদ্বেষ-বিষ-জর্জ্জরিত গ্রীন্ লিখিলেন, "দর্শকদের বিশ্বাস নাই। আজ তাহারা একজনকে প্রশংসা করিতেছে। কাল আবার আর একজনকে করিবে। দেখ না কেন—এক নবোত্থিত দাঁড় কাক আমাদের ময়ূরপুচ্ছে ভূষিত হইয়া, তাহার শার্দ্দূলের ন্যায় অন্তঃকরণকে অভিনেতার চর্ম্মে আবৃত করিয়া মনে করিতেছে যে, সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাট্যকারের ন্যায় অমিত্রাক্ষর রচনা করিতে পারে. বাস্তবিক ইহাকে রঙ্গালয়ের সব রকমের কাজ করান হয়. কিন্তু ইহার এত দম্ভ যে, ইহার বিশ্বাস যে দেশের মধ্যে সেই কেবল রঙ্গমঞ্চ কাঁপাইতে পারে।" (১) গ্রীণের ক্রুদ্ধ হইবার একটু কারণও ছিল। গ্রীণের দুই একখানি নাটক পরিবর্ত্তিত ও সেক্ষপীয়র কর্তৃক পুনর্লিখিত হইয়াছিল।

(১) "Yes, trust them not: for there is an upstart crow beautified with our feathers that with his 'tigor's, heart wrapped in a player's hide' supposes he is as well able to bombast out a blank-verse as the best of you; and bieng an absolute *Johannes factotum,* is, in his own conciet the only Shake-scene in a country."—Greene's Groats-worth of wit.

বিশেষ Henry VI নামক সেক্ষপীয়রের নাটকের ২য় ও ৩য় ভাগ গ্রীণের নাটক হইতে গৃহীত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গ্রীন্ পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্তব্যে তাহার একটু আভাসও দিয়াছেন। Henry VI তৃতীয় ভাগের প্রথম অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কে এই পংক্তি আছে—

"O tiger's heart wrapped in a woman's hide!"

এই পংক্তিই গ্রীণ নিজ মন্তব্যমধ্যে একটু পরিবর্ত্তন করিয়া বসাইয়াছেন, "with his tiger's heart wrapped in a player's hide" ("তাহার শার্দ্দূলের ন্যায় অন্তঃকরণ অভিনেতার চর্ম্মে আবৃত করিয়া")। ইহার পর Shake-scene শব্দটি পড়িলেই আমাদের বুঝিতে বাকি থাকে না যে, সেক্ষপীয়রই উক্ত আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য। নামের উল্লেখ ও কৌশলে গ্রন্থের পংক্তির উল্লেখ দ্বারা গ্রীন সেক্ষপীয়র-বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের গিরিশচন্দ্রের উপরও এইরূপ আক্রমণ হইয়াছিল তাহা দেখাইবার সময় পাঠক এইটুকু স্মরণ রাখিবেন।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বিদ্বেষোৎপত্তির দৃষ্টান্ত বহু আছে। কিন্তু প্রতিভাবান্ লেখকের প্রতি আক্রমণ চন্দ্রের প্রতি থুৎকার প্রদান-চেষ্টার ন্যায়ই ফলপ্রদ হয়। সে থুৎকার আক্রমণকারীর মুখেই আসিয়া পড়ে। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, গিরিশচন্দ্রেরও যৌবনে উচ্ছৃঙ্খলতা-দোষ ছিল, কিন্তু সাহিত্যের সমালোচনায় লেখকের চরিত্র বিচারযোগ্য নয়—লেখকের গ্রন্থই একমাত্র আলোচনার যোগ্য। এ আলোচনায় অন্য কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া নিরর্থক। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা তাঁহার গ্রন্থ হইতে বিচারিত হউক। প্রত্যক্ষ-দর্শী ভিন্ন তাঁহার শেষজীবনের ধর্ম্মভাব বিশ্বাস করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। তবে যাঁহারা নিপুণ দৃষ্টি-শক্তি-সম্পন্ন তাঁহারা গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী হইতেই তাঁহার শেষজীবনে ধর্ম্মের প্রভাব বুঝিতে পারিবেন। বিদ্বেষ-পরায়ণ সমালোচক গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনে এ ধর্ম্মভাব স্বীকার করুন আর নাই করুন তাঁহার নাটকাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

তবে কিছুকাল গিরিশচন্দ্রকে অপেক্ষা করিতে হইবে। সেক্ষপীয়র জগৎ-প্রসিদ্ধ নাটকাবলী রচনা করিয়াও সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীকাল অনাদৃত ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় নাটক লিখিয়া সেক্ষপীয়র ইংরাজের কাছে আদর পাইলেন না। সর্ব্বপ্রথমে জার্ম্মাণ সমালোচকগণ সেক্ষপীয়রের নাটকের মর্য্যাদা বুঝিলেন তাঁহাদের সমালোচনায়, তাঁহাদের প্রশংসায় ইংরাজের চৈতন্য হইল। সেক্ষ-

পীয়র যে গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, একজন মার্কিন তাহা ক্রয় করিয়া আমেরিকায় উঠাইয়া লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন। পরের আদরে পরের প্রশংসায় ইংরাজ ঘরের লোকের আদর করিতে শিখিল। আমাদের দেশেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পরে প্রশংসা করিয়াছে বলিয়া আজ রবীন্দ্রনাথের সমাদর হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের নাটক যদি ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়া পাশ্চাত্য মনীষিবৃন্দের প্রশংসাভাজন হয় তাহা হইলে হয় ত এদেশও তাঁহার প্রশংসা-মুখরিত হইয়া উঠিবে।

কিন্তু গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা করিতে পারেন। তাঁহার খ্যাতি বিজ্ঞাপন বা পক্ষপাতিতামূলক প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনারূপ বালুকাময় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে প্রতিভার অচল অক্ষয় শিলার উপর গঠিত। দশ, বিশ, পঞ্চাশ না হয় শত বৎসর পরেও তিনি বঙ্গীয় নাট্যকারগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন। এখন আমরা গিরিশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার সমসাময়িকগণ কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। লোকমুখে শ্রুত কাহিনীর উল্লেখ করিব না, যাহা মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, এইরূপ কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিলেই গিরিশচন্দ্রের প্রতি আক্রমণের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

প্রথমে ব্যবসায়জনিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সূত্রে গিরিশচন্দ্র যে ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ প্রয়োজনীয়। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার নব উদ্যমে মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালনা করিবার সঙ্কল্প করিয়া গিরিশচন্দ্রকে মিনার্ভা রঙ্গালয়ে আনয়ন করেন। গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় করাইবার সঙ্কল্প করেন। এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপনও প্রচারিত হয়। ক্লাসিক থিয়েটার তখন মিনার্ভা থিয়েটারের প্রতিযোগী। মিনার্ভায় সীতারাম অভিনীত হইবে শুনিয়া অতি ক্ষিপ্রতার সহিত শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সীতারাম নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসিকে সীতারাম অভিনীত হইবে এরূপ বিজ্ঞাপনও কলিকাতাময় প্রচারিত হইতে থাকে। এই সময়ে এক নূতন ধরণের প্লাকার্ড বাহির হইল। তাহাতে একটি পথের চিত্র। কতকগুলি লোক (অধিকাংশই হাস্যোদ্দীপক স্থূলোদর, বিকৃত শরীর) একটি বাড়ীর দেয়ালের দিকে তাকাইয়া আছে। উপরে লেখা আছে "ক্লাসিকে সীতারাম।" নিম্নে ছাপা "এ আবার কি!!" এই প্রকারে উভয় থিয়েটারে প্রতিযোগিতার উত্তেজনা-স্রোত বহিতে

লাগিল। মিনার্ভা রঙ্গালয়ে সীতারাম অভিনীত হইয়া গেল। গিরিশচন্দ্র সীতারাম, দানীবাবু গঙ্গারাম, অঘোরনাথ পাঠক চন্দ্রচূড়, তিনকড়ি শ্রী এবং সুশীলাবালা জয়ন্তীর অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। বহু অর্থব্যয়ে সুন্দর দৃশ্যাবলী প্রস্তুত হইয়াছিল। সীতারাম গোলাবর্ষণে মুসলমানগণের নৌকাসকল ডুবাইয়া দিলেন, এ দৃশ্যটি জীবন্তরূপে রঙ্গালয়ে প্রদর্শিত হইল। ক্লাসিকেও বৈচিত্র্যের জন্য অশ্বারোহণে সীতারাম প্রদর্শিত হইল। এই উত্তেজনার সময় একদিন ক্লাসিকের হাণ্ডবিলে ছাপা হইল —

"নাট্যজগতে মহা আন্দোলন !

কে জানে কার ভাল ? আপনারা বিচার করুন।"

এটুকু বেশ। দর্শক উভয় অভিনয় দেখিয়া শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করুন,—এই অনুরোধে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু এই হাণ্ডবিলের (তারিখ ১৩ই শ্রাবণ ১৩০৭ সাল, ইংরাজী ২৮শে জুলাই ১৯০০) মধ্যস্থলে গিরিশচন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি প্রকাশিত হইল,—

"ফাটধরা জ্যোতিঃহীন 'অয়স্কান্ত' আর চলে না ! এখন সকলের চোখ ফুটিয়াছে ভাল মন্দ বিচার করিতে শিখিয়াছে,—আগাগোড়া ফাঁকিতে আর কতদিন লোক ভোলে ? আর কেন বিড়ম্বনা ? নট-নাপিত নর্ত্তকী চল্লিশ পার হইলেই কাজের বার হইয়া যায় ! যাঁ'দের কাজ তাহারা করুক ! ধর্ম্ম উপাসনার সময় আসিয়াছে ; পরকালের দিকে মন দিলে,—আমরা সন্তান-তুল্য দেখিয়াও ধন্য হই ! কারণ ঐ বয়সে আমরাও ঐ দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে শিখিব ! আজ এই পর্য্যন্ত ! !"

এ আক্রমণ গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ের উপর। প্রৌঢ় গিরিশচন্দ্র অভিনয়ে অযোগ্য ইহাই উক্ত মন্তব্যের সার। গিরিশচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তি অয়স্কান্তের বর্ণে সূচিত হইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তেজনায় বিবেচনা-শক্তি কতদূর বিলুপ্ত হয়, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ পূর্ব্বোদ্ধৃত পংক্তিগুলি। ইহার আর প্রতিবাদ কি করিব ? প্রতিবাদরূপে আজিও বৃদ্ধাবস্থায় গিরিশচন্দ্রের করুণাময়, মীরজাফর, করিমচাচা প্রভৃতির অভিনয় রঙ্গালয়ানুরাগীর স্মৃতিপটে জাগরূক রহিয়াছে।

বড়ই সুখের বিষয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশে আত্মহারা হইলেও ক্লাসিক নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিল,—তজ্জন্য অনুতপ্তও হইয়াছিল। তাই ক্লাসিক আবার গিরিশচন্দ্রকেই নাট্যকার ও শিক্ষকরূপে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র ক্লাসিকে যোগদান করিলেন, এই সংবাদ ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩০৭ সালে (ইংরাজী ২৪শে নবেম্বর ১৯০০ সালে) প্রকাশিত হ্যাণ্ডবিলে ঘোষিত হইল। পূর্ব্ব আচরণ-স্মরণে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি হ্যাণ্ডবিলের তলদেশে মুদ্রিত হইল ঃ—

"বিশেষ দ্রষ্টব্য—নাট্যামোদী সুধীবৃন্দকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, নটকুল-চূড়ামণি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত আমাদের সকল বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় যে কয়েকটী স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে, সকলগুলিরই স্থষ্টিকর্ত্তা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র। প্রায় সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীই গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় গৌরবান্বিত। তাহার মধ্যে আমিও একজন। গিরিশবাবুর সহিত বিবাদ করিয়া নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলাম; বড়ই সুখের বিষয়, সমস্ত মনোমালিন্য অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, তাঁহার স্নেহময় কোলে আবার তিনি টানিয়া লইয়াছেন। গিরিশবাবুর, কোনও থিয়েটারের সহিত, এখন কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই। তাঁহার সমস্ত নূতন নূতন নাটক, গীতিনাট্য ও পঞ্চরং এখন ক্লাসিকে অভিনীত হইবে। ক্লাসিক থিয়েটার ব্যতীত অপর কোনও রঙ্গমঞ্চের সহিত গিরিশবাবুর কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র এখন ক্লাসিকের। নিবেদনমিতি।"

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্তই এই নিবেদন করিলেন। এরূপ মুক্তকণ্ঠে অপরাধ-স্বীকার তাঁহার গৌরবের পরিচায়ক। ক্ষণিক প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় ক্লাসিক গিরিশচন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, এ দোষ-স্বীকারে তাহার কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আবার যখন গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় যোগদান করিয়া নাটক লিখিতে ও অভিনয় করিতে লাগিলেন, তখন আবার তাঁহার উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল। এবারের আক্রমণ বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় আসিয়া "বলিদান" ও "হর-গৌরী" রচনা করিয়াছিলেন ও স্বয়ং "বলিদানে" করুণাময় ও "হর-গৌরী"তে হরের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া দ্ব্যর্থ বিজ্ঞাপন রচিত হইল। বিজ্ঞাপনের শিরোদেশে মুদ্রিত হইল,—

"৺শ্রীশ্রীহরগৌরী।"

তোমরা করুণাময়, করুণাময়ী বটে, কিন্তু যাহার ঘাড়ে চেলাদের নিয়ে ভর

কর, তার যে তৎক্ষণাৎ এস্পার ওস্পার, তার আর কথাটি নেই! শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ ছাগলের 'বলিদান' দিয়াও—এরূপ অশাস্ত্রীয় কাজ করিয়াও তোমাদের উদর পূরণ হয় না। ক্ষুদ্র ছাতুর বড়াতে তোমাদের কি হইবে গো? তফাৎ থেকে একটু আশীর্ব্বাদ করো, এই বাসনা! আর বলিদান নয়, এবার আত্মদান! জয় হর! জয় করুণাময়! দেখো প্রভু! আমার নাট্যজীবনবন্ধু দর্শকবৃন্দের ও তাঁদের বড় সাধের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কল্যাণের দিকে নজর ক'র না। তা হ'লেই আমি কৃতার্থ।" আর অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই পাঠক বুঝিবেন, প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গালয়ের হ্যাণ্ডবিলে কিরূপে গিরিশচন্দ্র লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

সাহিত্যিকগণের নিকট গিরিশচন্দ্র কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছেন তাহাও একবার অনুসন্ধান করা উচিত। "ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য" নামক গ্রন্থের ৩২৬ পৃষ্ঠায় রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত গিরিশচন্দ্রের দুই একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "ওরূপ প্রহসন বা উপন্যাস তৃতীয় শ্রেণীর লেখকও লিখিতে পারে।" তাহা না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু শুধু এই রচনার নিকৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া রায় সাহেব ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি গিরিশচন্দ্রের মনের ভাব অনুমানে বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গিরিশচন্দ্র কেন ঐরূপ লিখিলেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে উদ্যত রায় সাহেব লিখিলেন—"বেশী বড় হইবার জন্য আঁকুপাঁকু করিতে গেলেই পড়িয়া যাইতে হয়। যশোলিপ্সা? অর্থার্জ্জন? আর কেন? ঢের হইয়াছে।" গিরিশচন্দ্র তখন জীবিত ছিলেন। উদ্ধৃত পংক্তিগুলির পর কয়েকটি পংক্তিতে গিরিশচন্দ্র একটি বিবাহের কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া রায়সাহেব গিরিশচন্দ্রের দুর্গতি হইয়াছে লিখিয়াছিলেন ও উপদেশ দিয়াছিলেন যে, গিরিশচন্দ্র রচনা ছাড়িয়া রামকৃষ্ণদেবের কথা বর্ণনা করুন।

'ভিক্টোরিয়া যুগে বঙ্গ-সাহিত্য' গ্রন্থে রায়সাহেব গিরিশচন্দ্রের প্রশংসাও করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্তব্যটি অহেতুক। গিরিশচন্দ্রের সকল গ্রন্থই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়, কিন্তু তাহা যে "বেশী বড় হইবার জন্য আঁকুপাঁকু করিবার ফল" তাহার প্রমাণ কি? ১৬ই মার্চ্চ ১৯১২ তারিখের বসুমতীতে "নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ" নামক মল্লিখিত প্রবন্ধে (যাহা পর সপ্তাহে সমাপ্ত হয়) এ উক্তির প্রতিবাদ হয়। সুখের বিষয়, ইহার পর রায়সাহেব নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র কিন্তু তখন পরলোকে। রায়সাহেব এইরূপে নিজ দোষ স্বীকার করেন—

"যে অপ্রিয় প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া ভক্তের হিসাবে তাঁহার নিকট একটু অনুযোগ করিয়াছিলাম, জীবনে বড় ক্ষোভ রহিয়া গেল —সেই কালবাক্যই ফলিয়া গেল।" * * * 'ছোট ভাই বলিয়া তুমি আমায় দেখিয়াছিলে। অপরাধী আমি। হায়! শেষ ক্ষমা চাহিবারও অবসর আমায় দিলে না।"

(নাট্যমন্দির, ৩য় বর্ষ, ১৩২ ও ১৩০ পৃষ্ঠা)

রায় সাহেব নিজ দোষ স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইতাম, কিন্তু তিনি নিজ আচরণের আবার কৈফিয়ৎ দিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, "কঠোর কর্ত্তব্য" পালন করিতেই তিনি গিরিশচন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। "বেশী বড় হইবার জন্য আঁকুপাঁকু করা" প্রভৃতি উক্তি কঠোর কর্ত্তব্য-প্রসূত কি না পাঠক তাহার বিচার করুন। আর বিচার করুন গিরিশ চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার চরিত্র-সম্বন্ধে রায়সাহেবের নিম্নলিখিত উক্তিটি কতদূর সঙ্গত,—

"ভাবান্তর নাহি মাত্র তব করুণার,
হে দীন-শরণ !
মাগে বা না মাগে কৃপা বিলায় ধরায়
বরিষার বারি-বরিষণ।
বিধবার ধনাপহরণ,
ভ্রুণহত্যা, কুলস্ত্রী-গমন,
ত্যজি কন্যা পুত্র নারী　　পাপাসক্ত অত্যাচারী
লোকত্যজ্য ঘৃণিত জীবন,
তব দ্বার মুক্ত তার পতিত-পাবন।"

আত্মনিবেদনে অকপটহৃদয়ে গিরিশ ইষ্টদেবতার চরণে এই গাথা গান করিয়াছেন।...... এ অমর গাথার সম্যক বিচার-বিশ্লেষণের দিন এখনও আসে নাই, উত্তরকালে কোনও সত্যানুরাগী শক্তিধর পুরুষ তাহা সম্পন্ন করিবেন।"

["বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র" প্রবন্ধ
নাট্যমন্দির ২য় বর্ষ, ১২৬-১২৭ পৃষ্ঠা]

উদ্ধৃত কবিতার পংক্তিগুলি গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক রামকৃষ্ণ দেবের উদ্দেশে রচিত একটি কবিতা 'হইতে সংগৃহীত। এই পংক্তিগুলিতে 'যত বড়ই পাপী হউক না কেন রামকৃষ্ণদেবের কৃপায় তাহার মুক্তি হইবে' এই ভাবমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। রায় সাহেব কোন্ সূক্ষ্মদৃষ্টিবলে বাহির করিলেন যে, ইহা গিরিশচন্দ্রের নিজ পাপ

স্বীকার! বিধবার ধনাপহরণ, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি পাপগুলি কোন্ প্রমাণে গিরিশচন্দ্র-কৃত বলিতে রায় সাহেব অগ্রসর? সহজ ও সরল অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এরূপ ইঙ্গিত করিবার প্রয়োজন কি? রায় সাহেব নিজেই "সত্যানুরাগী শক্তিধর পুরুষ"-রূপে প্রমাণ করুন যে, গিরিশচন্দ্র উদ্ধৃত পংক্তিতে উল্লিখিত সর্ব্ববিধ পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে অহেতুক এরূপ ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়া ফল কি? পংক্তিগুলি পাঠ করিয়া রায় সাহেবের কল্পিত অর্থের লেশমাত্র আভাসও আমরা প্রাপ্ত হইলাম না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

প্রাচীন ভারতে মানমাত্রা।

বহুপূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে বৃক্ষবীজাদির দ্বারা পরিমাণমাত্রা নির্দ্ধারিত হইত। বৈদিকযুগে যখন কৃষিকার্য্যই আর্য্যগণের প্রধানতম অবলম্বন ছিল সেই সময় এই রীতির প্রচলন হয়।

আফিমের বীজই ওজনের ক্ষুদ্রতম মাত্রা ছিল। অপেক্ষাকৃত ভারী দ্রব্য ওজন করিতে হইলে যথাক্রমে সর্ষপ, যব ও গঞ্জিকা-বীজ আবশ্যক হইত। গঞ্জিকা বীজের নাম রতি (সংস্কৃত—কৃষ্ণাল বা রক্তিকা Abrus Precatorius) এখনও স্বর্ণকারগণ ইহার দ্বারা স্বর্ণাদি ধাতুর ওজন করিয়া থাকেন, রৌপ্যাদি ওজন করিতে হইলে মাষার ব্যবহার হয়। (১) প্রাচীনকালে ইহা সীমের বীজকে বুঝাইত, এক্ষণে ইহা শব্দে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। পাঁচ রতিতে এক মাষা হয়, অর্থাৎ পাঁচটী গঞ্জিকাবীজ একটী সীমের বীজের সমান। প্রাচীনকালে স্বর্ণের ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইত সেইজন্য তাহার বিশেষ নাম হইয়াছিল "সুবর্ণ"। রৌপ্যপরিমাণের সর্ব্বোচ্চ মাত্রা শতমান। শতমানে ৩২০ রতি বা এক নিষ্ক হয়। মনুসংহিতায় অনেকপ্রকার মানমাত্রার উল্লেখ আছে, যথাঃ—নিথ্য,

(১) "Masha * * * an elementary weight in the system of goldsmiths' and jewellers' throughout India, and the basis of the current silver coin.—Wilson's glossary of Indian terms.

রাজসর্ষপ, গৌরসর্ষপ, যব, কৃষ্ণাল, রক্তিকা, সুবর্ণ, পল, ধরণ (পুরাণ), কার্ষ (কার্ষপণ), শতমান, ও নিষ্ক।

মনুসংহিতাকার যেরূপ বিধান করিয়াছেন তদনুসারে মানমাত্রায় একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

রৌপ্য।

২ রতি	=	১ মাষা					
৩২ ,,	=	১৬ ,,	=	১ ধরণ			
৩২০ ,,	=	১৬০ ,,	=	১০ ধরণ	=	১ শতমান	

স্বর্ণ।

৫ রতি	=	১ মাষা								
৮০ ,,	=	১৬ ,,	=	১ সুবর্ণ						
৩২০ ,,	=	৬৪ ,,	=	৪ ,,	=	১ নিষ্ক				
৩২০০ ,,	=	৬৪০ ,,	=	৪০ ,,	=	১০ ,,	=	১ ধরণ		

তাম্র।

৪ কার্ষপণ = ১ পল = ৩২০ কৃষ্ণাল (২)

মনু উইলসনের মতে ৮০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে আবির্ভূত হন, সুতরাং আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে উল্লিখিত মানমাত্রার প্রচলন ছিল ইহা নিঃসন্দেহ। হিন্দুসভ্যতার ইহা উজ্জ্বলতম নিদর্শন সন্দেহ নাই।

"সূত্রস্থানম্" নামক সুপ্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থে মানসূত্র লিখিত আছে। পরিমাণ-জ্ঞানব্যতীত দ্রব্যসকল যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যায় না, তাহার আবার মতভেদ আছে—একটীর নাম কালিঙ্গ পরিভাষা, অর্থাৎ কলিঙ্গ-দেশ-প্রচলিত পরিভাষা এবং অপরটীর নাম মাগধ পরিভাষা, অর্থাৎ মগধ-দেশ-প্রচলিত পরিভাষা।

কালিঙ্গ পরিভাষা।

গবাক্ষমধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে অতি ক্ষুদ্র রেণুবৎ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, উহার নাম ধ্বংসী।

৬ ধ্বংসী	=	১ মরীচি
,, মরীচি	=	১ রাজিকা

(2) Journal of the Asiatic Society of Bengal—1864—Footnote.

৩	রাজিকা	=	১ সর্ষপ
৮	সর্ষপ	=	১ যব
৪	যব	=	১ গুঞ্জতা বা রতি
৬	রতি	=	১ মাষা (হেম বা ধান্যক
৪	মাষা	=	১ শাণ
২	শাণ	=	১ কোল
২	কোল	=	১ কর্ষ
২	কর্ষ	=	১ অর্দ্ধ পল
২	শুক্তি	=	১ পল
২	পল	=	১ প্রসৃতি
২	প্রসৃতি	=	১ অঞ্জলি
২	অঞ্জলি	=	১ মাণিকা
২	মাণিকা	=	১ প্রস্থ
৪	প্রস্থ	=	১ আঢ়ক
৪	আঢ়ক	=	১ দ্রোণ
২	দ্রোণ	=	১ সর্প
২	সর্প	=	১ দ্রোণী
৪	দ্রোণী	=	১ খারী

মাগধ-পরিভাষা।

৩০	পরমাণু	—	১ ত্রসরেণু বা ধ্বংসী
৬	ধ্বংসী	—	১ মরীচি
৬	মরীচি	=	১ সর্ষপ
৬	সর্ষপ	=	১ যব
৩	যব	=	১ এক গুঞ্জতা বা রতি
১০	রতি	—	১ মাষা

কালিঙ্গ পরিমাণে ১২ রতিতেও মাষা ধরিবার নিয়ম আছে যথা :—

তৎকালিঙ্গং দ্বাদশভী রক্তিভির্মাষকঃ স্মৃতঃ (বৈদ্যকশাস্ত্র)

বহু প্রাচীন কালে আমাদের দেশে নিক্কের প্রচলন ছিল বলিয়া বোধ হয়। মৃচ্ছকটিকে তাহার উল্লেখ আছে। মহাভারতেও আছে :—

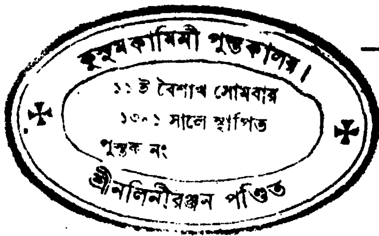
শতং দাসী সহস্রাণি কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ।
কম্বুকেয়ূর ধারিণ্যো নিষ্ককণ্ঠ্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ॥
—বনপর্ব্ব।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে :—

দেশাদ্দেশাৎ সমোচানাং সর্ব্বাসামাঢ্যদুহিতৃণাম্।
দশাদদাৎ সহস্রণ্যো ত্রয়ো নিষ্ককণ্ঠ্যঃ॥

বেদেও নিষ্কশব্দের উল্লেখ বিরল নহে। "In IV, 37, 4V, 19, 3, and many other places, we have allusions to the Nishka, a golden ornament worn in the neck." (৩) উল্লিখিত স্থলসমূহে নিষ্কশব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা পরবর্ত্তী সংখ্যায় আলোচনা করিব।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।


কুসুমকামিনী পুস্তকালয়।
১১ই বৈশাখ সোমবার
১৩০১ সালে স্থাপিত
পুস্তক নং
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শান্তির পথে।*

চেয়ারখানিতে হেলান দিয়া সে বসিয়াছিল। তাহার চঞ্চল হাত দুটী, সেলায়ের সূতা ও কাপড়ের টুকরাটুকু নিশ্চল ভাবে তাহার কোলের উপর পড়িয়াছিল; কারণ তাহার চিত্ত তখন মোহময় অতীতের স্বপ্নরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার চুলগুলি প্রায় তুষার-শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে, মুখমণ্ডলের চর্ম্ম বিলোল ও সঙ্কুচিত, তবুও তাহার মুখে অতীত সৌন্দর্য্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। সে সুন্দরী ছিল বটে, কিন্তু অনেক দিন আগে।

হঠাৎ একটা শব্দে তাহার মধুর অতীত স্বপ্ন টুটিয়া গেল, বোধ হয় কোন পাখী জানালায় আঘাত করিতেছে; কিন্তু সে বহু চেষ্টায় তাহার মধুময় স্মৃতিসূত্রগুলি আর এক করিতে পারিল না। সে দুই হাতে মুখ

(৩) R. C. Dutt's Ancient India.
—P. 50.

* একটী জার্ম্মাণ গল্প হইতে—

ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। একটা প্রবল উচ্ছাসে ও ব্যথায় যেন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, ক্ষীণদেহযষ্টি কাঁপিয়া উঠিল।

কক্ষের দ্বার মুক্ত হইল।

"মার্থা, তুমি শপথ করেছিলে না?" আরও একটু উচ্চে "মার্থা, মার্থা, আমি তোমায় আজ একটা কথা বল্‌তে এসেছি, শোন, সে সব একবারেই মিথ্যা।"

অত্যধিক বিস্ময়ে যেন বৃদ্ধার নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু মুখে কোন আগ্রহের চিহ্ন দেখা গেল না।

'মার্থা' বলিয়া নবাগতা রমণী চেয়ারের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল, তাহার পরিপুষ্ট মুখখানি আশঙ্কায় লাল হইয়া উঠিল। সে এক হাতে বৃদ্ধার ক্ষীণ কটি বেষ্টন করিয়া অন্য হাতে তাহার অশ্রু-সজল মুখখানি হইতে শীর্ণ হাত দুটী সরাইয়া দিল।

"মার্থা, আমি যা বলতে চাচ্ছি শোন।" তাহার স্বর দৃঢ় ও আগ্রহপূর্ণ।

বৃদ্ধার বিরল বিস্রস্ত কেশে স্থূল অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে রমণী বলিল, "একটু স্থির হয়েছ? বেশ! বেশ!"

বৃদ্ধার কম্পিত ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে অতি অস্পষ্ট ভাবে বাহির হইল, "হুঁ"।

প্রবল উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসের আবেগে রমণী অসংযতভাবে বলিল, "আজ যা শুনেছি, একবার ভেবে দেখ মার্থা, সে সব সম্পূর্ণ মিথ্যা—বুঝ্‌তে পার্‌লে —একবারেই সত্যি নয়।"

"মেনি তুমি কি বল্‌ছ।"

"আহা, তোমার মাথায় ঢুকছে না? তুমি বুঝতে পার্‌ছনা? সে এখনো বেঁচে আছে,—কিন্তু তোমার জন্য নয়—বুঝ্‌লে কি?"

বৃদ্ধার মুখখানি বড়ই বিবর্ণ হইয়া গেল; কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে যে মেনি কি বলিতেছে।

বিদ্যুতের চপল চমকের মত তাহার জীবনের অতীত কাহিনী হঠাৎ তাহার স্মৃতি-পথে জাগিয়া উঠিল।

ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বে সে ডাক্তার জন্‌সকে ভাল বাসিয়াছিল। জন্‌সের আগ্রহের অভাব দেখিয়া প্রতিবেশিগণ এ মিলনে সন্দেহ করিয়া মাথা নাড়িয়াছিল; কিন্তু মার্থার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় আসে নাই। ক্রমে ক্রমে জন্‌স মার্থার বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে লাগিল, জুয়াখেলায় যোগ দিল, সুরা-

পান আরম্ভ করিল ও মার্থাকে ভুলিয়া গোপনে অন্যান্য রমণীর পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। একথা মার্থার কানে পৌছিতে দেরী হইল না। সে জনসকে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিত ও তাহার প্রেম-মন্দিরে কেবল মার্থারই স্থান আছে এই আশায় সে ভরপুর হইয়াছিল; তাই এ আঘাতে তাহাকে বড়ই চঞ্চল করিয়া তুলিল। জন্স মার্থার নিকট আসিল। আগ্রহে সে মার্থার হাতখানি আপনার হাতে টানিয়া লইতে চাহিল, কিন্তু মার্থা ক্রোধে ও অভিমানে হাত ছাড়াইয়া লইল। জন্স জানু পাতিয়া মার্থার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিল, কিন্তু মার্থা একটা শুষ্ক ও কঠোর হাস্যের অভিনয় করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল। তারপর দিন হইতে আর জন্সকে দেখা যায় নাই। কয়েক দিন পরে একটা মৃতদেহ নদীতীরে আসিয়া ঠেকিল, তাহার বিকৃত মুখমণ্ডল স্পষ্টভাবে চেনা না গেলেও পরিচ্ছদের দুই একটি চিহ্ন ও পরিচ্ছদপ্রান্তে 'জন্স' নাম দেখিয়া মার্থা সকলই বুঝিতে পারিল।

তাহার পর প্রতিক্রিয়ার ভাষণ আক্রমণ তাহার বুকের মধ্যে আগুন জ্বালিয়া দিল। প্রবল আত্ম-ধিক্কারে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, প্রেমাস্পদের এরূপ অপ্রত্যাশিত অকাল মৃত্যুর শোকে সে মুহ্যমান হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস একটু শান্ত হইল বটে, কিন্তু মধুময় স্মৃতির করুণ আবেগে তাহার চিত্ত পূর্ণ হইল।

"আহা, সে আমারই জন্য আত্মহত্যা করেছে!" এই চিন্তা যখনই তাহার মনে আসিত, তখন সে উচ্ছল বাষ্পস্রোত দমন করিতে পারিত না। তপ্ত করুণ অশ্রুস্রোতে তাহার গণ্ড দুটী প্লাবিত হইয়া উঠিত।

নিজের বাসায় নির্জ্জনে তাহার মন বড়ই আকুল হইয়া উঠিত তাই সে তাহার ভগিনী মেনির গৃহে আশ্রয় লইল। তাহার নিকটে নূতন বিবাহের প্রস্তাব আসিলে সে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিত। প্রতিদিনের গদ্যময় ঘটনাপুঞ্জ ও চারিদিকে নীরস ও মধুরত্ব-বর্জ্জিত প্রেমচিত্রগুলি দেখিয়া তাহার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইত। সে তখন বিপুল আগ্রহে ও গর্ব্বে আপনাকে নিজের অতুল প্রেম চিত্রের মধ্যে বিলীন করিয়া দিত। তাহার প্রেমাস্পদ জীবনে যাহা দিতে পারে নাই, মৃত্যুর মধ্যে আজ সে তাহা লাভ করিল। তাহার হৃদয়ে এক অপার্থিব অতুলনীয় অতি পবিত্র প্রেমের উজ্জ্বল মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। ইহার সহিত কি চারিদিকের এই বিশেষত্বহীন, স্বার্থ-পূর্ণ প্রেমের তুলনা হয়! কখনই নয়! এইরূপে অতীত জীবনের মধু

স্মৃতির মধ্য দিয়া সে তাহার মৃত প্রেমাস্পদকে পূজা করিয়া আসিতেছিল।

ম্যাডাম্ মেনি উত্তেজনার আবেগে দ্বিগুণ আগ্রহে তাহার কথা আরম্ভ করিল।

"এখন ভেবে দেখ মার্থা, আমি বরাবর বলে এসেছিলাম যে, সে ভয়ানক পাজী। দেনায় ডুবে গিয়েছিল। কেবল টাকার লোভে তোমায় বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিল। আমি কি তখন তোমায় বলিনি। সে মহাজনদের উৎপীড়নে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল। তোমার অনুগ্রহ লাভ কর্‌লে দেখে মহাজনেরা আর তাকে জ্বালাবে না; কারণ তাদের দৃষ্টি তখন জন্‌কে ছেড়ে তোমার অর্থের উপর এসে পড়েছিল, এ অবস্থায় তোমাকে ভালবাসা ছাড়া কি তার অন্য উপায় ছিল? কি পাজী! যদি একবার তাকে এই ঘরের মধ্যে পেতুম!"

ক্রোধে মেনির চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ ও অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিবদ্ধ হইল।

বৃদ্ধা স্থাণুর মত নিশ্চল ভাবে বসিয়াছিল। তাহার মুখে উদ্বেগের লেশ-মাত্র নাই—কিন্তু শীর্ণ মুখখানি পাংশুর মত মলিন।

মেনি বলিল, "তার খবর পাওয়া গেছে। সে এখন সিড্‌নীতে আছে। একজন ধনী বিধবার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। ছেলেবেলায় ঐ জ্যাক্ ব্রাউন বলে যে ছোকরাটি আমার সঙ্গে নাচ্‌ত তুমি বোধ হয় তাকে চেন। আহা, সে বেচারীও প্রেমে পড়ে চলে গেল!"

মেনির মুখের ভাব দেখিয়া তাহাকে ব্যথিত বলিয়া মনে হইল না। সে নিজ উক্তির সার্থকতা ভাবিয়া বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিতেছিল।

"জ্যাক্ আজকে এখানে এসেছিল—সে ভয়ানক বিবর্ণ হয়ে গেছে। সেই আমায় সব কথা খুলে বল্‌লে। ওকি মার্থা! তুমি আমার দিকে অমন ক্রুদ্ধভাবে চাইছ কেন? শান্ত হও। বৃথা এত কাল শোক কর্‌লে—তুমি আবার—আবার হয়ত—দেখ আবার হয়ত ফিরে—"

ম্যাডাম্ মেনি ভগিনীর নিষ্প্রভ ও স্থির চক্ষু দুটীর দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

একটু ব্যথিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল; "তোমায় কি সুখবর দিই নি?"

মার্থা কোন উত্তর করিল না। সে অতি যত্নের সহিত তাহার সেলায়ের সাজগুলি মেজে হইতে কুড়াইয়া লইয়া দাঁড়াইল ও দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইল।

অতি ধীরে মেনির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "দেখ মেনি, এই সন্ধ্যাবেলায় আমায় একটু একা থাকতে দাও, তুমি জান না কিন্তু তবুও আমি তোমায় ধন্যবাদ দি।"

মেনি বলিল, "কিন্তু মার্থা—"

"তুমি এখন যাও ভাই—"

"কেন আমি তোমায় কি করলুম।"

"আমি বলছি তুমি বুঝতে পার নি।"

"আমায় খুলে বল, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

মার্থা হঠাৎ ফিরিয়া মেনির মুখের দিকে চাহিল। তাহার চক্ষু দুটী নিষ্প্রভ ও পলকবিহীন!

"তুমি আমার কি করেছ? আমার জীবনের শান্তি কেড়ে নিয়েছ। যার জন্য আমি বেঁচেছিলুম, যে স্মৃতির আবরণে আমি নিজেকে ঢেকে রেখে ছিলুম, তা'তে তুমি আগুণ ধরিয়ে দিয়েছ। হৃদয়ের বাঞ্ছিত দুঃখের হার-খানি ছিঁড়ে দিয়েছ।"

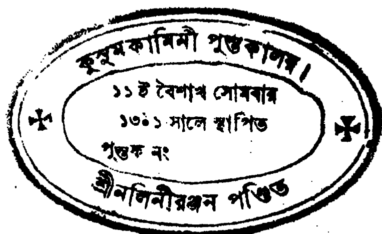
মার্থা দ্বারের দিকে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

মেনির ছোট মেয়েটি রাত্রিতে মায়ের কোলে ঘুমাইবার সময় বলিল, "শোন না, বাতাস কেমন হু হু করছে।"

কিন্তু এ বাতাসের হুতাশ নয়। আজ সেই ব্যথিতা বৃদ্ধা চির জীবনের শান্তি-লাভের আশায় চলিয়াছে!

শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র।


কুসুমকামিনী পুস্তকালয়।
১১ ই বৈশাখ সোমবার
১৩০১ সালে স্থাপিত
পুস্তক নং
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

ইতিহাসে ভিক্ষুপ্রসঙ্গ।

ইতিহাস ইতিহাস বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে বড়ই একটা হুজুগ পড়িয়াছে। ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহে শিক্ষিত-মণ্ডলীর অত্যাগ্রহ দেখা যাইতেছে। স্বসমাজের অথবা পর-সমাজের অতীত ঘটনাবলী দেশের পুরাতন সভ্যতা ভব্যতা প্রভৃতি জানিতে মানবমাত্রেরই আগ্রহ স্বভাবসিদ্ধ। ইতিহাসের সহিত প্রাচীন হিন্দুজাতি যে একবারেই অপরিচিত ছিলেন, এমত ধারণা ঠিক নহে। কারণ সংস্কৃতগ্রন্থে ইতিহাসের বহুল উল্লেখ দেখা যায়। ইতিহাস যে একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল, উপনিষদ্ গ্রন্থও এ বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে। মহর্ষি নারদ সনৎকুমার-সমীপে উপস্থিত হইয়া যে সকল শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ইতিহাসেরও উল্লেখ আছে। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭।১) এমন কি ধর্ম্মশাস্ত্রেও ইতিহাসের সমাদর দেখা যায়। মহর্ষি দক্ষ দৈনিক-কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ইতিহাস-পুরাণপাঠের দ্বারা দিবসের ষষ্ঠ ভাগ ও সপ্তম ভাগ অতিবাহিত করিবে।*

কিন্তু বর্ত্তমান ইতিহাসপ্রিয় যুগের ইতিহাস এবং প্রাচীনযুগ-প্রসিদ্ধ ইতিহাস এই উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ দেখা যায়। প্রাচীনযুগের ইতিহাস "পুরাবৃত্ত" অর্থাৎ লোকপরম্পরাপ্রসিদ্ধ কোনও একটা ঘটনানুযায়ী গল্প সুতরাং তাহাতে ধারাবাহিক দেশবিবরণ বা বংশাবলী সন্নিবেশিত হয় নাই। মহাভারতে অনেক স্থলেই দেখা যায়, কোনও একটি বিষয়ের দৃষ্টান্তস্থলে "অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্" এই বিষয়ে পুরাতন ইতিহাসও উদাহৃত হয়, এইরূপ উল্লেখ করিয়া কোনও একটা গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে মাত্র। আধুনিক ঐতিহাসিকের অভিপ্রেত ইতিহাসের ভাব পুরাণে বরং অনেকটা দেখা যায়। ইদানীন্তন একশ্রেণীর ঐতিহাসিকের মতে প্রসিদ্ধ লোকদিগের জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি প্রধান ঘটনাবলীর কালনির্ণয়ই যেন মুখ্য ইতিহাস, অন্যান্য যাহা কিছু, তাহাতে ইতিহাস-শব্দের ব্যবহার গৌণ বা লাক্ষণিক।

সুতরাং মুখ্য ইতিহাসের উপাদান প্রাচীন শিলালিপি, মুদ্রা ও তাম্র-শাসন, কারণ কাল-নির্ণয়-বিষয়ে এই কয়টার মত প্রমাণ আর দেখা যায় না।

---

* ইতিহাস পুরাণাভ্যাং ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিন্তু তারিখ-নির্ণয়-প্রধান ইতিহাসের বিশেষ উপযোগিতা অনুভূত হয় না, পূর্ব্ববর্ত্তি-সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, বর্ত্তমানে কোন বিষয়ে তাহার কতদূর ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, এই সমস্ত বিষয় যাহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, তাদৃশ শাস্ত্র চিত্র মূর্ত্তি প্রভৃতির সাহায্যে নির্ম্মিত ইতিহাসেরই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। সন তারিখ ঠিক না থাকিলেও প্রাচীন শাস্ত্রনিচয় অতীতাবস্থার সাক্ষ্য প্রদানে বিশেষ পটু। এমন কি আধুনিক শিক্ষিতের চক্ষুঃ-শূলায়মান নীরস স্মৃতি-শাস্ত্রের সাহায্যে আমরা অতীত যুগের বিবরণ যতটা জানিতে পারি, তারিখ-প্রধান ইতিহাসের দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও জানিতে পারি না।

স্মৃতি-শাস্ত্রে যে কেবল খাদ্যাখাদ্য শৌচাশৌচই বিবেচিত হইয়াছে, তাহা নহে, ইহাতে সমাজের কল্যাণকর যাবতীয় বিষয়ই বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। মানব-সমাজের রীতিনীতি, ধর্ম্মভাব, রাজ-শাসন-প্রণালী, শিল্প-বাণিজ্যপদ্ধতি, প্রভৃতি জ্ঞাত হইবার একমাত্র উপায় স্মৃতি-সংহিতা এবং স্মৃতিনিবন্ধ। অনেকস্থলে এই সকল সুদৃঢ়-প্রমাণ উপেক্ষিত হওয়ার ফলে অনেক সভ্যতা বা শাসন-প্রণালী দেশান্তরে উদ্ভাবিত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, কোথাও বা তাহা অসঙ্গত বলিয়াও সমালোচিত হইতেছে। এই সম্বন্ধে আজ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি বিষয়ের আলোচনা করিব।

আমাদের দেশের আধুনিক রীতি দেখা যায় যে, দ্বারে ভিক্ষুক উপস্থিত হইলেই গৃহস্থ তাহাকে ভিক্ষা দান করিয়া থাকেন। এই রীতি যে অতীব প্রাচীন এবং শাস্ত্র-সম্মত, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

কারণ ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে, বায়ুকে আশ্রয় করিয়া যেমন সমস্ত জন্তু বাঁচিয়া থাকে, সেইরূপ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া অন্যান্য আশ্রম অবস্থান করে * ভিক্ষুও একটি আশ্রম, সুতরাং এই আশ্রমকে রক্ষা করিতে গৃহস্থ বাধ্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা অধিক স্থলেই দেখিতে পাই যে, আশ্রম-পোষণের পরিবর্ত্তে অনাশ্রমীরই পরিপোষণ ঘটিয়া থাকে। সমর্থ যুবক-যুবতী হাঁক্ মারিলেই গৃহস্থ তণ্ডুল-হস্তে তাহাদের সমীপে উপস্থিত হয়। শাস্ত্রে কিন্তু এই শ্রেণীর ভিক্ষুর পোষণের পরিবর্ত্তে রাজ-শাসনেরই ব্যবস্থা দেখা

* যথাবায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
এবং গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ ॥৩।৭৭।

যায়। সে শাসন মৃদু নহে, ভিক্ষুকের পক্ষে নহে, সে শাসন কঠিন অথচ ভিক্ষা-দাতার। মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন:—

"অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদং বধৈঃ। ১।১২

যে গ্রামে ব্রতস্থ নয়, অথচ অধ্যয়ন-রত নয় এমন দ্বিজাতি ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, রাজা সেই গ্রামবাসীকে বধদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। যেহেতু সেই গ্রাম চোরের অন্ন যোগাইয়া থাকে। ভিক্ষা-দাতার প্রতিই যখন এইরূপ কঠোর দণ্ড-বিধান ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, তখন এই শ্রেণীর ভিক্ষুক যে কিরূপ সম্মানিত হইতেন, তাহা অনায়াসেই বুঝাইতেছে। শুনা যায়, বর্ত্তমান সময়েও পাশ্চাত্য দেশে সাধারণ ভিক্ষুক রাস্তায় বাহির হইলে তাহাকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হয়, পূর্ব্বকালে আমাদের দেশেও এই শ্রেণীর ভিক্ষুককে চোর-নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের প্রতিও দণ্ডের বিধান ছিল, এমত বুঝা যাইতেছে। যাঁহারা ব্রতস্থ অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত-বিশেষের আচরণে প্রবৃত্ত, তাদৃশ দ্বিজাতির পক্ষে ভিক্ষাহারের ব্যবস্থা আছে এবং যাহারা অধীয়ান অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অধ্যয়নে প্রবৃত্ত, তাদৃশ দ্বিজাতির জন্যও ভিক্ষালব্ধান্নভোজন বিহিত হইয়াছে। সংসার-বিরক্ত চতুর্থা-শ্রমীর নামই ভিক্ষু, সুতরাং ভৈক্ষান্ন-ভক্ষণই তাঁহার জীবনধারণের উপায়। উল্লিখিত কয়টি ভিন্ন অন্ধ আতুর প্রভৃতি অসমর্থ ব্যক্তিগণ রাজা বা রাজকল্প ধনীর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইত, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার নিদর্শন দেখা যায়। শক্তের পক্ষে ভৈক্ষচর্য্যার ব্যবস্থা কুত্রাপি দেখা যায় না। এমন কি গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের পক্ষেও ভিক্ষাবৃত্তি প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, প্রত্যুত নিন্দিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। মনু যে সকল ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধান্ন-ভোজনের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, * তাহাদের তালিকায় নিত্য-যাচনকারীরও উল্লেখ দেখা যায়। ভাষ্যকার মেধাতিথিও বলিয়াছেন যে, ইহা বস্তুর স্বভাব, যাচ্ঞার দ্বারা যাচ্যমানের উপদ্রব হইয়া থাকে। স্মৃতি-শাস্ত্র গৃহস্থকে স্বাবলম্বন করিবার অভিপ্রায়েই যত্ন করিয়াছে, পরপিণ্ডোপজীবী অসার করিতে কখনও উপদেশ দেয় নাই। মনু স্পষ্টতই যাচ্ঞালব্ধ ভৈক্ষকে "মৃত" অর্থাৎ মরণতুল্য কষ্ট-

---

* আচারহীনঃ ক্লীবশ্চ নিত্যং যাচনকস্তথা। ৩।১৬৫।
বস্তু স্বভাবোঽয়ং যাচ্ঞয়া যাচ্যমানোদ্বেজনম্।—মেধাতিথি।

দায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (মৃতস্বযাচিতং ভৈক্ষং ৪।৫) অত্রির কঠোর দণ্ডবিধানের প্রতি লক্ষ্য করিল মনে হয়, তাঁহার সময়ে ভিক্ষুকের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহাদের দ্বারা গৃহস্থের অনেক প্রকার অনিষ্টও আচরিত হইত। বাৎস্যায়নের কামসূত্রপাঠে ইহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। ভিক্ষুকীগণ ভিক্ষা-ব্যপদেশে নায়কনায়িকার দৌত্যকার্য্য সম্পাদন করিত, সুতরাং অনেক কুলকামিনীকেও যে কুলের বাহির করিত, তাহা বলাই বাহুল্য। অদ্যাপি যে ভিক্ষুকের দ্বারা অকার্য্য সম্পাদিত হয় না, এমন কথা বলা যায় না. চৌর্য্যকার্য্যে অনেক ভিক্ষুকেই ব্যাপৃত দেখা যায়। এদেশে একটা চিরপ্রসিদ্ধ কথা আছে যে, দেখিলেই মস্করী, আর না দেখিলেই তস্করী, * এই কথাটা আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে শুনা যায় না। তাহাতে মনে হয়, যে, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানে ভিক্ষুকের সংখ্যা ও সম্মান বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহারই প্রভাবে বৌদ্ধাক্রান্ত দেশে তস্করী-মস্করীর অনুষ্ঠান হইত।

বৃদ্ধ-প্রব্রজিতাগণ রাজান্তঃপুরে অবস্থিত হইয়া নানাপ্রকার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। বাণভট্টের বর্ণনায় জানা যায় রাণী-বিলাসবতীকে† বৃদ্ধ প্রব্রজিতাগণ ধর্ম্মোপদেশদানে বিনোদিত করিতেন, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অধঃপতনের অবস্থায় ভিক্ষুকের বিলাসিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 'প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে' এই শ্রেণীর ভিক্ষুকের অতীব বীভৎস চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু নিজের মুখেই ব্যভিচারপরায়ণতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মুখ হইতে কবি সেকালের যে, ঘটনা বাহির করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ করিতেও লজ্জা বোধ হয়- সুতরাং কেবল মূল শ্লোকটিই এই স্থলে প্রদর্শিত হইল, যথা—

"রণ্ডাঃ পীনপয়োধরাঃ কতি ময়া চণ্ডানুরাগাদ্ভুজ-
বন্ধাপীড়িত-পীবর-স্তন-ভরং নোদ্গাঢ়মালিঙ্গিতাঃ।
বুদ্ধেভ্যঃ শতশঃ শপে যদি পুনঃ কুত্রাপি কাপালিনী-
পীনোত্তুঙ্গ-কুচাবগাহন-ভবঃ প্রাপ্তঃ প্রমোদদয়ঃ (৩ অঙ্ক)

এই শ্রেণীর ভিক্ষুগণ যে কেবল লাম্পট্যেই অভ্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে, সুরাপানেও ইহাদের বিশেষ পটুটার পরিচয় পাওয়া যায়,—'প্রবোধচন্দ্রোদয়

---

* মস্করী। (ভিক্ষুঃ পরিব্রাট্কর্ম্মন্দী পারাশর্য্যপি মস্করী) অমর। ব্রহ্মবর্গ

† ধর্ম্মোপদেশান্নিবেদয়ন্তীভির্জরৎ প্রব্রজিতাবিবিনোদ্যমানাম্। কাদম্বরী। ১৮১ পৃ

নাটকে'রই কল্পিত ভিক্ষু বলিয়াছেন যে, আমরা সুবদনার মুখোচ্ছিষ্ট-বকুল-পুষ্প-বাসিত-মধুর-রস মদিরা বেশ্যার সহিত কতবার পান না করিয়াছি; কিন্তু এখন বোধ হইতেছে যে দেবগণ কপালিনীর (ভৈরবীর) মুখস্থ আসব-সুরভি এই সুরা না পাইয়াই অমৃতের জন্য স্পৃহা করেন।*

মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখা যায় সেকালে ভিক্ষুগণ "নষ্ট" নামেও অভিহিত হইয়াছিলেন। এক ভিক্ষু কোন এক গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, গৃহস্বামী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভিক্ষু! মাংস ভক্ষণ কর কি? ভিক্ষু উত্তর করিল, মদ্য ব্যতীত মাংস-ভক্ষণ কি রকম? গৃহস্থ বলিলেন, মদ্যও কি তোমার প্রিয়? ভিক্ষু, হাঁ প্রিয় বটে কিন্তু বেশ্যার সহিত। গৃহস্থ হতভম্ব হইয়া বলিলেন, বেশ্যা ত অর্থ ব্যতীত মিলে না, তোমার অর্থ কোথায়? ভিক্ষু বলিল, দ্যূতক্রীড়ার দ্বারাই অর্থ সংগ্রহ হয়।

গৃহস্থ বলিলেন, চৌর্য্যদ্যূতও তোমার অভ্যস্ত?

তখন বাহাদুর ভিক্ষু উত্তর করিল—নষ্টের আর উপায়ান্তর কি?† এইরূপ বর্ণনা আপাততঃ কবি-কল্পনার অতিরঞ্জন বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে এই শ্রেণীর ভিক্ষুক বর্ত্তমান যুগেও বিরল নহে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অধঃপতনের অবস্থায় ভিক্ষুকের এই অমানুষিক চিত্র-দর্শনে মনে হয়, অধিকারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সাধারণকে অপবর্গের দিকে টানিয়া লওয়ার চেষ্টাতেই পবিত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মের এই শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে।

মহাপ্রভু-চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত উদারধর্ম্মের ইদানীন্তন শোচনীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেও মনে হয়, পরবর্ত্তী স্বার্থান্ধ সংসারাসক্ত কপটস্বভাব কতিপয়

---

* নিপীতা বেশ্যাভিঃ সহ কতি নরারান্ সুবদনা
মুখোচ্ছিষ্টা স্বাভির্বিকচ বকুলামোদমধুরা।
কপালিন্যা বক্ত্রাসব-সুরভি মেতাত্ত মদিরা।
মলুক্ৎ জানীমঃ স্পৃহয়তি সুধায়ৈ সুরগণঃ। (৩ অঙ্ক)

† ভিক্ষো! মাংসনিষেবনং প্রকুরুষে কিন্তেন মদ্যং বিনা।
মদ্যঞ্চাপি তব প্রিয়ং প্রিয় মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ।
বেশ্যাপ্যর্থরুচিঃ কুতস্তবধনং দ্যূতেন চৌর্য্যেণবা।
চৌর্য্যদ্যূত-পরিগ্রহোঽস্তি ভবতো নষ্টস্য কান্যা গতিঃ। সাহিত্য দর্পণ।

মানব মহাপুরুষের ভক্ত সাজিয়া ধর্ম্মের অছিলায় মূল-ধর্ম্মের অপব্যবহার করিতেছে। যিনি একটিমাত্র হরীতকী-সংগ্রহের অপরাধে ভক্তকে সন্ন্যাসীর দল হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারই নাম ধরিয়া ভক্তব্যপদেশী অনাশ্রমী ভিক্ষুকের দল পরপিণ্ডোপজীবী সাজিয়া হিন্দু-সমাজের এক অসার অবস্থার অভিনয় করিতেছে। পূজ্যপাদ ৺মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার মহাশয়ের মুখে এবং ৺হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের মুখে নবদ্বীপবাসী ভক্ত-প্রবর সুগৃহীত-নাম সিদ্ধ চৈতন্যদাসের যে পবিত্র চরিত্র শুনিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, তাদৃশ বৈষ্ণবের দর্শনলাভও বিশেষ পুণ্যসঞ্চয় ব্যতীত ঘটে না।

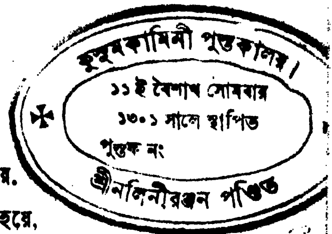
উপসংহারে বক্তব্য এই যে, অধিকারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে, যে আশ্রমেই থাকা যায় সে আশ্রমই দূষিত হইয়া থাকে, তবে খাবার ভারটা নিজের উপর থাকিলে মানুষ মানুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, পক্ষান্তরে পরের স্কন্ধে খাবার ভার চাপাইলে মনুষ্যত্বই বিদূরিত হইয়া যায়। সুতরাং হৃষ্টপুষ্ট দেহ সংসারাসক্ত-ভিক্ষাজীবীকে মানুষের তালিকা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া গণনা করাই বোধ হয় সমীচীন।

স্বাবলম্বন প্রাচীন হিন্দুগণ শ্রাদ্ধাবসানে অভীষ্টফলদাতা পিতৃপুরুষের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেন—

"যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু, মাচ যাচিষ্মকঞ্চন"

আমাদের নিকট অন্যে যাচ্ঞা করুক আমরা যেন কাহাকে যাচ্ঞা করি না। অদ্যাপি এই পবিত্র স্বাবলম্বন প্রার্থনার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।



গুণগ্রাহী।

গুণী জনে গুণ গায় গুণি-গুণ লয়ে,
নির্গুণের কাছে তাহা যায় দোষ হয়ে,
নদীর সুস্বাদু নীর পশিলে সাগরে,
অপেয় হইয়া যায়, ক্ষার গুণ ধরে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ।

গিরিশ-বাণী।

(তত্ত্ব-কথা)

সুনাম।

এ দুঃখের সংসারে ভগবান একটি রত্ন দেন, সে রত্ন যার আছে, সেই ধন্য! সুনাম! রাজার মুকুট অপেক্ষাও সুনাম শোভা পায়, দীন দরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে ধনী অপেক্ষাও উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্খ বিদ্বান অপেক্ষাও পূজ্য হয়।

মাতৃপ্রেম।

যার মার মুখ না মনে পড়ে, তার পৃথিবীর অতি অল্প ভগ্নাংশই মনে পড়ে। মুক্তযোগী শুকদেব মাতার আশ্রমে মায়াখণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যিনি মা চিনেন নাই, তিনি বিশ্বে চেতন পদার্থ কিরূপে স্থাপিত, মহাবিজ্ঞান জানিয়াও জানেন না। কিরূপে বিশ্ব থাকিবে, কিরূপে বিশ্ব চলিতেছে, ইহা মাতৃস্নেহ অনুভব ব্যতীত উপলব্ধি করা অসম্ভব এবং তাহার বিপরীতই সম্ভব। কিন্তু যিনি মাতৃপ্রেম পান, প্রেম তাঁহার বাল্যাভ্যাসিত, প্রেমের ক্রিয়া তাঁহার অতি সহজ।

মনের ধর্ম্ম।

চুপ ক'রে বসে মন ব্যাটাকে দেখি, খালি ব্যাটা ফাঁকি দেবার চেষ্টায় ফিরছে; কেন যে, তা মনের কথা মনই বুঝে না, বল্‌বে কি! বলে ব্যাটা সুখের জন্যে ঘুরি; আর সৃষ্টির অসুখের কাজেই ঘোরে।

দয়ার ভাণ।

দয়া ক'রে যদি কখনও কারুকে কিছু দিই, তো মনে হয়, যদি একটা মেলা হতো তো লোক জড় হ'য়ে দেখতো। কারুকে কিছু লুকিয়ে দিলে মনে হয়, আমি ত লুকিয়ে দিচ্ছি, আর পাঁচজনে দেখ্‌লে তো তাদের চোখে আগুণ লাগতো! তারপর কোন আত্মীয় বন্ধুকে গোপনে ডেকে বলা আছে, অমুক লোকটা এসেছিল তাকে কিছু দিলাম,—বড় দুঃখে পড়েছিল, তাই দিলাম। যদি কখনও কারুর উপকার করি, আর সে যদি জন্মের মতন আমার গোলাম না হয়, অমনি রাগের সীমা পরিসীমা থাকে না।

সাম্য-স্থাপক দর্শন।

'সাম্য', 'সাম্য' এই কথা সকলের মুখেই শুনি, বাস্তবিক সমস্ত মানব এক পরিবার-স্বরূপ বাস করে এইরূপ উন্নত অবস্থা-লাভই মনুষ্য-সমাজের চরম। কিন্তু সে চরম অবস্থা পাইবার সম্ভাবনা কি? কাহারও মস্তিস্কে উদ্ভূত হইয়াছে, অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিলেই পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ রহিত হইবে। অতএব নরঘাতী অস্ত্রসকল সৃজন করিয়া সংসারে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু দেখা যায়, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাবৃদ্ধিই অস্ত্রবৃদ্ধির একমাত্র কারণ। কেহ আবার বলেন দার্শনিক শিক্ষার দ্বারাই মানব এক পরিবারস্থ হইবে। কিন্তু দর্শন ত নানাবিধ, কোন্ দর্শনবলে এক পরিবারস্থ হইবে? যদি এরূপ কোনও দর্শন থাকে, যাহার শিক্ষায় বুঝিতে পারা যায় যে, তুমি আমি এক, তোমায় ক্লেশ দিলে আমি ক্লেশ পাইব—যদি ঐরূপ একত্ব-স্থাপন কোনও দর্শনের দ্বারা সম্ভব হয়—তা' হলেই জগতে সাম্য প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, নচেৎ নয়। সে সাম্য-স্থাপক দর্শন—বেদান্ত-দর্শন।

ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম ভাণ হয়, ধর্ম্ম হৃদয়ের বস্তু—অর্জ্জন করা যায় এবং সেই অর্জ্জনই সার অর্জ্জন।

সত্ত্বগুণের অধিকারী কে?

ভগবান বলেছেন, কার্য্য ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। জড় তমোগুণী কি চৈতন্য লাভ কর্‌তে পারে? সৎকার্য্য-ফলে হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তবে সে নির্ব্বাণে অধিকারী। জড় হয়ে থাক্‌লে যে সত্ত্বগুণী হয়, তা মনে করো না। বীর ব্যতীত কেউ সত্ত্বগুণ লাভ করে না।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞের অর্থ কি?

এক মন, এক ধ্যান হ'য়ে কার্য্যে ব্রতী হওয়া, পাপ-পুণ্য উভয়কে তুচ্ছ করা, শত শত প্রলোভন উপেক্ষা করা, কামিনী-কটাক্ষ না হৃদয়ে বিদ্ধ হয়, কাঞ্চন না আকর্ষণ করে, সম্মানে না নরত্ব দূর করে।

হিন্দুর প্রকৃতি।

অনভ্যাসে কার্য্যকারী রজোগুণ দূর হয়েছে, সকলে তমোগুণে অভিভূত,

এই নিমিত্ত সকলে কার্য্যভীরু। সাংসারিক কার্য্যে সাহসহীন বটে, অপঘাতের ভয়ে অস্ত্রচালনা করে না, কিন্তু অন্তিম সময়ে দেখা যায় যে, হিন্দুর তিল মাত্র মৃত্যুভয় নাই। অপর অপর জাতি যে সকল কথায় উত্তেজিত হয়, পরমার্থ-প্রার্থী হিন্দু-হৃদয় তাহাতে উত্তেজিত হয় না। আত্মীয়-রক্ষা, স্বদেশ-রক্ষা, এ সকল কথায় কর্ণ-পাতও করে না; চায় মুক্তি, যে কার্য্য দ্বারা মুক্তি-লাভ বুঝে, নির্ভীক হৃদয়ে সে কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হবে। এমন হিন্দু অতি বিরল, যে ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য কিছুমাত্র উত্তেজিত হয় না।

প্রকৃত দয়া।

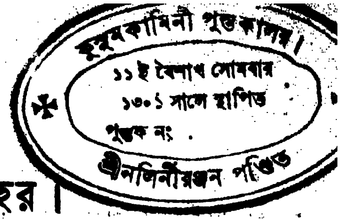
আমার চিরধারণা যে, প্রত্যেক নারী মহামায়ার রূপান্তর। দয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৃত্তি মানবজীবনে আর নাই। নারী এমনই মায়াবী, সেই বৃত্তি অবলম্বনে পুরুষ-হৃদয় মুগ্ধ করে। শত শত দৃষ্টান্ত পাবে যে, মৃত বন্ধুর পত্নীকে আশ্রয় দান কর্‌তে গিয়ে আশ্রয়দাতার যুবতী-সংসর্গে মন বিচলিত হয়েছে। ক্রমে বন্ধুত্ব, মনুষ্যত্ব, কর্ত্তব্য—সকলই বিস্মৃত হ'য়ে সেই বন্ধুপত্নীর সহিত নিরয়গামী হ'য়েছে। নির্ম্মল দয়ার লক্ষণ শুন। কদাকার, বহুপুত্র-ভারে পীড়িতা রমণী সম্পূর্ণ দয়ার পাত্রী। কিন্তু দেখ, তদপেক্ষা উন্নত অবস্থার সুন্দরী রমণী অনেকের দয়ার ভাজন। যদি কেহ সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, মলাবৃত, কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত জীবকে পরমাসুন্দরী রমণীর ন্যায় বিমলচক্ষে দর্শন করে, সমভাবে উভয়ের শুশ্রূষা-সাধনে নিযুক্ত থাকে, সেই মহাপুরুষই প্রকৃত দয়ার্দ্রচিত্ত! দয়ার এই লক্ষণ যার হৃদয়ে অঙ্কিত নাই, যার কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত আর সুন্দরীতে সমদৃষ্টি নাই, আমার অনুমানে সে যথার্থ দয়ার অধিকারী নয়।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

প্রিয় ও অপ্রিয়।

প্রিয়জন দোষরাশি গুণ হয় মনে
অপ্রিয়ের গুণরাজি ব্যথা দেয় প্রাণে;
প্রচণ্ড ভানুর তাপে প্রফুল্ল বদন,
নলিনী সহিতে নারে শশীর কিরণ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ।



আকবরী মোহর।

১

"হ্যাঁ গা কাজ-কর্ম্মের কিছু জোগাড় হ'ল ?"

স্বামী আহারে বসিয়াছিল। স্ত্রী কমলাবালা তাহার গায়ে পাখার হাওয়া করিতে করিতে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

স্বামী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "পোড়া অদৃষ্টে আর চাকুরী মিলিল না। মনে করেছিলাম দেশে ফিরে যাব, কিন্তু চারিদিকে যে রকম দেনাপত্র ক'রে রেখেছি, তা'তে এখান থেকে চলে যাওয়াও দায়।"

কমলা বলিল—"তা তুমি আর দুটী ভাত ডাল মেখে খাও, আমি না হয় একটু তেঁতুলের সঙ্গে চিনি গুলে দিচ্ছি। ভগবান কি আমাদের এর চেয়েও কষ্ট দেবেন, এইবার চাকুরী নিশ্চয় হ'বে।"

কমলা তেঁতুল আনিতে ঘরে গেল। স্বামী সতীশচন্দ্র জোরে একটি নিঃশ্বাস টানিয়া মনে মনে বলিল, "সরলা স্ত্রীলোক! চাকুরীর বাজারের মহার্ঘতা ত জানে না, তাই বলে গেল 'নিশ্চয় হবে'। আমি ত এই সংসার-সমুদ্রে ভাস্‌ছি, চাকুরী-রূপ কিনারা কখনও পাব কি না জানি নে। বরং হাবুডুবু খেয়ে মর্‌বার সম্ভাবনাই বেশী।"

ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া সতীশচন্দ্র কেবল ডাল-মাখা ভাতই দ্রুত-গতিতে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। দৈন্যের চিন্তায় কমলা যে তেঁতুল আনিতে গিয়াছে, তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। সহসা কমলাকে পাথর বাটী হাতে আসিতে দেখিয়া সতীশচন্দ্রের মনে তেঁতুলের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল; সে বলিল, "কমলা আমি অন্যমনস্ক হয়ে কেবল ডাল-মাখা ভাতই খেয়ে ফেলেছি, তেঁতুলের কথা আর মনে নাই।" এই বলিয়া সতীশচন্দ্র উঠিয়া পড়িল।

কমলা তেঁতুলের বাটী হাতে করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। আজ স্বামীর মানসিক অবস্থা দেখিয়া কমলার প্রাণে নিদারুণ ব্যথা লাগিল। সে পানের ডাবরের নিকটে বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তারপর উপরের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, "ভগবান মানুষকে সকল কষ্ট দিও, এমন অন্নকষ্ট দিও না।"

সত্য সত্যই সতীশচন্দ্রের চাকুরী যাইবার দুইমাস পর হইতেই তাহাদের এরূপ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এমন অনেক দিন গিয়াছে, কমলা নিজে না খাইয়াও স্বামীর অজ্ঞাতসারে স্বামীকে খাওয়াইয়াছে।

২

আজ প্রায় দশ মাস হইল, সতীশচন্দ্রের চাকুরী গিয়াছে। সতীশচন্দ্র যখন দূর পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় লিণ্টন কোম্পানীর আফিসে ৩০৲ টাকা বেতনে চাকুরী করিতে আসিয়াছিল, তখন একদিনের জন্যও তাহার মনে হয় নাই যে, চাকুরী বিশেষতঃ সওদাগরী আফিসের চাকুরী পদ্মপত্রের জলবিন্দুর মত। সে অনেক উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে করিতে আসিয়াছিল। পাঁচ বৎসর সে এখানে চাকুরী করিল। কিন্তু তাহার বেতন ৩৫৲ টাকার উপরে উঠে নাই। তবুও কিন্তু সতীশচন্দ্রের মনে আশা,—এইবার বছর দুইএকের মধ্যেই তাহার ৫০৲ টাকা বেতন হইবে।

সতীশচন্দ্রের পরিবারটী যে, খুব বড় তাহা নহে। তাহার স্ত্রী কমলা, পিতৃমাতৃ-হীন মাসতুতো ভাই হরিহর, একটী শিশু পুত্র আর আপনি। এ ছাড়া দেশের একজন দাসীও তাহাদের সংসারে ছিল। সতীশচন্দ্র যে বেতন পাইত, তাহাতে এই ক্ষুদ্র পরিবার নেহাইত অস্বচ্ছল না হইয়াও চলিয়া যাইতে পারিত; কিন্তু এই সামান্য বেতন হইতে ৬০০৲ পিতৃ-ঋণ পরিশোধের জন্য তাহাকে প্রতি মাসে দশ টাকা করিয়া পরিশোধ করিতে হইত। বাকী ২০৲ বা ২৫৲ টাকায় সংসার চালান যে কিরূপ কষ্টকর, স্ত্রী কমলা তাহা বেশ বুঝিয়াছিল। তবে একটা সুখের কথা এই, সতীশচন্দ্রের যে মাসে চাকরী যায়, সেই মাসেই তাহার পিতৃ-ঋণ শোধ হইয়াছিল। কিন্তু দেনাশোধের জন্য হাঁফ ফেলিতে না ফেলিতে সে একদিন আফিসে গিয়া শুনিল, "লিণ্টন কোম্পানীর বিলাতের হেড আফিস লাল বাতী জ্বালিয়াছে বলিয়া কলিকাতার আফিসও জাল গুটাইল। কেরাণীরা সকলে দুই মাসের করিয়া বেতন পাইবে।"

খবর শুনিয়া সতীশচন্দ্রের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। সে শুষ্কমুখে দুই মাসের মাহিনা পকেটে করিয়া পত্নী কমলার হাতে দিল। কমলা এক সঙ্গে ৭০৲ টাকা দেখিয়া ভাবিল, "হ্যাঁ গা এ যে দেখছি তোমার দু'মাসের মাহিনে! এখন ত মাহিনে পাবার সময় নয়, তবে বুঝি সাহেবেরা তোমার মাহিনা বাড়িয়ে দিয়েছে, না বক্‌সিস করেছে।"

সতীশচন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ বক্‌সিসই করেছে বটে, কারণ না দিলেও ত তাহাদের কিছু করতে পারতেম না। আর তোমার কাছে লুকিয়েই বা কি করব, কাল থেকে আমার আর আফিসে যেতে হবে না, অফিসে উঠে গেল। অন্যত্র আবার চেষ্টা ক'রে চাকরী জুটিয়ে নিতে হ'বে।"

কমলা বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি গো! সাহেবদের আফিস বুঝি আবার উঠে যায়?"

সতীশ বলিল, সাহেবেরা বুঝি মানুষ নয়, তাদের কারবার বুঝি ফেল হ'তে পারে না।"

৩

এই ঘটনার পর আট মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। চাকুরীর জন্য দ্বারে দ্বারে উমেদারী করিয়া সতীশচন্দ্র নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। দিন আর চলে না। ধার করিয়া আর কত দিন চলিবে? বন্ধু-বান্ধব ধার দিয়া দিয়া বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পাওয়ানাদারেরা কথার ঠিক না পাওয়ায় সতীশচন্দ্রকে জুয়াচোর বলিয়া ঠাওরাইয়াছে। দৈন্যের তাড়নায়, অভাবের প্রকোপে, স্ত্রীপুত্রের কষ্ট-দর্শনে সতীশচন্দ্রের মনুষত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে। সময় বুঝিয়া শয়তানও মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে। তাহার মনের ভিতরে ভাল-মন্দ, সু-কু উভয়ের দ্বন্দ্ব চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিবেকের সঙ্গে তাহার মনের যুদ্ধ চলিতেছে। একদিকে স্ত্রী-পুত্র-ভ্রাতার শুষ্ক মুখ ও ধর্ম্ম পথ, সেই সঙ্গে পাওনাদার-তাগাদা-বিদ্রূপ আর বন্ধুবান্ধবের উপেক্ষাজনিত মুখভাব। অপর দিকে সহজ সরল অধর্ম্ম পথ, সে পথে স্ত্রীপুত্রের আর অভাব-জনিত শুষ্ক মুখ নাই, পাওনা-দারদের তাগাদা-বিদ্রূপ বা বন্ধুবান্ধবের উপেক্ষা নাই। এইদিকটাই তবে ত ভাল! আমি যখন দরিদ্র তখন আমার আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? যেমন করিয়া পারি চুরি করিয়া হউক—জুয়াচুরী করিয়া হউক—স্ত্রী-পুত্রকে অনাহারের ক্লেশ হইতে রক্ষা করিব।

অভাবের তাড়নায় সতীশচন্দ্রের মনের মধ্যে যখন এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন সতীশচন্দ্র আপনার বাড়ীতে একটী ছিন্ন মাদুরের উপর শুইয়া ছিল। এমন সময়ে তাহার শিশু পুত্র তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া গেল।

সতীশচন্দ্র চিঠিখানি খুলিয়া ফেলিল। উহা তাহার জনৈক বন্ধুর লেখা। চিঠিখানিতে এইরূপ লেখা ছিল:—

"তুমি কণ্ট্রাক্টর রায়-ব্যানার্জ্জির অফিসে একখানা দরখাস্ত করিবে। সেখানে একজন হিসাব-রক্ষকের প্রয়োজন আছে। কালই দরখাস্ত লইয়া সেখানে যাইতে চাও; না হইলে সে কাজে অন্য লোক বহাল করিয়া লইবে। তুমি সরাসরি গিয়া ব্যানার্জ্জি সাহেবের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার হাতে দরখাস্ত দিবার বিশেষ চেষ্টা করিবে।

পত্রটী পাঠ করিয়া সতীশচন্দ্রের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। তাহার মনের ভিতর বিবেকের সঙ্গে যে যুদ্ধ চলিতেছিল তাহার তখনও নিবৃত্তি হয় নাই। সে বলিল, "বেশ এই চাকুরীটা যদি হয় তবে ভাল, নইলে আমি আর ধর্ম্মপথে থাকৃব না।"

সে তাড়াতাড়ি কাগজপত্রের একটা তাড়া পাড়িয়া লইয়া তাহা হইতে কাগজ বাহির করিল এবং একখানা দরখাস্ত লিখিয়া ফেলিল। তার পর উহা একটা বড় খামের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়া দিল।

পর দিন বেলা ১১টার সময় সে রায়-ব্যানার্জ্জি কোম্পানীর আফিসে উপস্থিত হইল। শুনিল, আফিসের মালিক সি, ব্যানার্জ্জি সাহেব তখনও আফিসে আসেন নাই; আর আধ ঘণ্টা পরে আসিবেন। সতীশচন্দ্র এদিক ওদিক পাইচারী করিয়া আধ ঘণ্টা কাটাইয়া আসিল। আসিয়া শুনিল, ব্যানার্জ্জি সাহেব আসিয়াছেন। সে তখন ধীরে ধীরে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল।"

ব্যানার্জ্জি সাহেব মাথা নীচু করিয়া কার্য্য করিতেছিলেন, তিনি মুখ তুলিয়া চাহিতেই সতীশচন্দ্র তাঁহার হাতে দরখাস্তখানি দিলেন। ব্যানার্জ্জি সাহেব দরখাস্তখানি পড়িলেন এবং উহা সতীশের হাতে ফেরত দিয়া বলিলেন,—"কাল বৈকালে এই কাজে লোক নিযুক্ত হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে দরকার হ'লে আপনি দরখাস্ত করিবেন।"

সতীশ পুনরায় অভিবাদন করিয়া বাহিরে আসিল। সে আজ না খাইয়াই বাড়ী হইতে দরখাস্ত হাতে করিয়া বাহির হইয়াছিল। দরখাস্তের পরিণাম দেখিয়া তাহার আর বাড়ী ফিরিতে সাহস বা ইচ্ছা হইল না। বাড়ীর দিকে যাইতে গেলেই তাহার পা কে যেন জড়াইয়া ধরিতে লাগিল! কাজেই সতীশচন্দ্র অন্যদিকে চলিল। ক্ষুধায় তাহার পেটে খিল ধরিবার উপক্রম হইতেছিল। চলিতে চলিতে সে পূর্ব্বে যেখানে লিণ্টন কোম্পানীর আফিস ছিল, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারই নিকটে একটা খাবারের দোকান। সতীশচন্দ্র যখন লিণ্টন কোম্পানীর আফিসে কার্য্য করিত, তখন এই দোকানে খাবার খাইত। আজ তাহাকে সেখান দিয়া যাইতে দেখিয়া দোকানদার খাতির করিয়া ডাকিল,—"আসুন, দোকানে আসুন।"

সতীশের মনে একটা কু-মতলবের সঞ্চার হইল। ক্ষুধায় তাহার বড় কষ্ট হইতেছিল। সে বলিল, "তোমার দোকানই খুঁজছিলাম হে! আবার

আজ থেকে তোমার দোকানেই খাবার খেতে হবে! শুনেছ, রায়-ব্যানার্জ্জির অফিসে আমার কাজ হ'য়েছে।" দোকানদার শুনিয়া খুব খুসী হইয়া বলিল, "বেশ হয়েছে বাবু! তবে কিনা আমার দোকান থেকে একটু দূরে পড়েছে।" সতীশচন্দ্র বলিল, "দূর আর কি বল, আধ পো তিন ছটাক রাস্তা যদি দূর হয়, তা হ'লে আমার মত গৃহস্থ লোকের ত আর কাজ চলে না। তোমার দোকানের খাবার খুব ভাল, আর তার ওপর তুমি বেশ ভদ্র, পাঁচ বৎসর তোমার সঙ্গে একটানা দেনা-পাওনা হয়েছে, সেই টানেই তোমার কাছে এসেছি।"

দোকানদার সতীশচন্দ্রের কথা শুনিতেছিল, আর বাবুর জন্য তাহার ভাল ভাল খাবার তুলিতেছিল। সে খাবারের ঠোঙ্গাটী বাবুর হাতে দিয়া বলিল, "বাবু, খান।"

সতীশচন্দ্র ধীরে ধীরে তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিল; তার পর এক ঘটি জল খাইল। পরে দোকানদারের কাছ থেকে দুটী সুপারী লইয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল,—"আস্‌ছে সপ্তাহে মাস কাবার, মাহিনে পাব, তোমার হিসাব ঠিক ক'রে রেখ, সব চুকিয়ে দিব।"

দোকানদার সতীশকে যথেষ্ট বিশ্বাস করিত; সে আর দ্বিরুক্তি করিল না। সতীশচন্দ্র যে কয়টা পয়সা তাহাকে ঠকাইবে,—এ বিশ্বাস তাহার মোটেই ছিল না। কিন্তু তাহার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি আসিয়া যায়, ক্ষুধার্ত্ত দৈন্য-পীড়িত সতীশচন্দ্র পূর্ব্বের বিশ্বাস লোকের নিকট বেচিয়া এখন অবিশ্বাস কিনিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

খাবার খাইয়া সতীশ যখন রায়-ব্যানার্জি কোম্পানির অফিসের নিকট আসিল, তখন সে চমকিয়া উঠিল। একবার ভাল করিয়া পিছনে ফিরিয়া দেখিল, তাহাকে কেহ দেখিতেছে কি না। তখন সে দ্রুতপদে আঁকা বাঁকা রাস্তার ভিতর দিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। বাড়ী যাইতে তাহার একটুও মন সরিল না।

৪

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা সতীশচন্দ্র ঘুরিতে ঘুরিতে যখন বালীগঞ্জের মাঠের কাছে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সে দেখিতে পাইল, আমাদের সঙ্গে কচি কচি সাহেবদের ছেলে-মেয়েরা মাঠে হাওয়া খাইতে আসিয়াছে। তাহারা হাসিমুখে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে

সতীশচন্দ্র আপনার মনে বলিতে লাগিল, "এরা যেন কখনও অভাবের মুখ দেখে নাই, সকলেই যেন এক একটী স্বচ্ছলতার প্রতিমূর্ত্তি, আমিই কেবল দৈন্যপীড়িত, আমিই কেবল লক্ষ্মীছাড়া!" তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্ত্রী-পুত্রের শুষ্ক মুখ মনে পড়িল, সে ভাবিল,—যাহার ভাব তাহার আবার ধর্ম্মা-ধর্ম্ম কি? যেমন করিয়া পারি টাকা উপায় করিব, তা চুরি করিয়াই হোক, আর জুয়াচুরি করিয়াই হোক।"

সতীশচন্দ্র এই ভাবিয়া পূর্ব্ব মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং মনে মনে সংকল্প করিল,—টাকা না লইয়া আর বাড়ীতে ঢুকিতেছি না। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন পৃথিবীর পৃষ্ঠে নামিয়া আসিতেছে, দূরে একটী একটী করিয়া গ্যাসের আলো জ্বলিয়া উঠিতেছে। এমন সময়ে সতীশচন্দ্র দেখিল, তাহার পার্শ্ব দিয়া "রাইডিং স্যুটে" সজ্জিত রায়-ব্যানার্জ্জি কোম্পানির মালিক ব্যানার্জ্জি সাহেব যাইতেছেন। সতীশচন্দ্র মনে করিল, ব্যানার্জ্জি-সাহেবকে বেশ নির্জ্জনে পাইয়াছি, নিকটেও কোন লোক নাই, একবার তাঁহাকে দুঃখের কথাটা জানাইয়া আসি। সতীশচন্দ্র যাইবে কি না ভাবিতেছে, এমন সময়ে ব্যানার্জ্জি-সাহেব হঠাৎ দুম্ করিয়া ঘাসের উপর পড়িয়া গেলেন। সতীশচন্দ্র তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া দেখিল, সত্যসত্যই ব্যানার্জ্জি সাহেব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার দাঁতি লাগিয়া গিয়াছে। নিকটে আর কেহই নাই। কিছুদূরে একটা জলের কল ছিল, সতীশ তাহাতে চাদর ভিজাইয়া আনিল। তারপর ব্যানার্জ্জি সাহেবের মুখের দাঁতি ছুরির বাঁট দিয়া খুলিয়া দিয়া মুখের মধ্য কয়েক ফোঁটা জল দিল এবং মুখে চোখে জলের ঝাপ্টাও দিতে লাগিল। হাতে একখানা খবরের কাগজ ছিল, সেটা পাখার কাজ করিতে লাগিল।

সতীশচন্দ্র যখন ব্যানার্জ্জি-সাহেবের এইরূপ সেবা করিতেছে, তখন হঠাৎ তাঁহার পায়ের কাছে একটা ছোট বাক্স দেখিতে পাইল। সে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, উহা একটা সোনার নস্যদানী এবং বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত। সতীশচন্দ্রের মুখখানিতে একটু হাসি দেখা গেল; সে উহা নিজের পকেটে রাখিয়া সরিয়া পড়িব পড়িব মনে করিতেছে, এমন সময়ে ব্যানার্জ্জি সাহেব পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন এবং জল চাহিলেন। সতীশচন্দ্র আর পলাইতে ইচ্ছা করিল না, আবার কল হইতে চাদর ভিজাইয়া জল আনিয়া ব্যানার্জ্জি সাহেবের মুখে দিল। ব্যানার্জ্জি সাহেব সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "কে আপনি?

আপনাকে ভদ্রলোক বলিয়া মনে হচ্চে। আপনার এই উপকারের জন্তে আমি কৃতজ্ঞ। যদি দয়া ক'রে আমাকে বাড়ীতে রেখে আসেন, তবে ভাল হয়। আমার বাড়ী ঐ ওখানে—দেখা যাচ্চে।" বলিতে বলিতে ব্যানার্জ্জি সাহেব তাহার কাঁধে ভর দিয়া বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিলেন। পথে বলিলেন,—"আমার স্ত্রী ও কন্যা জাহাজ ডুবি হ'য়ে মরে যাবার পর থেকে আমার এই রোগ হয়েছে। মাঝে মাঝে তাদের যাতনা উপলব্ধি ক'রে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ি। এই আমার বাড়ী, আপনি আমাকে এই নীচের ঘরে নিয়ে চলুন।"

সতীশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি সাহেবকে লইয়া নীচের তলার একটা বড় সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে তখন বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছিল; দুই জন খানসামা ও একজন দরওয়ান দ্বারে বসিয়াছিল। তাহারা সাহেবের অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি নিকটে আসিল। সাহেব তাহাদিগকে সেইখানেই বসিয়া থাকিতে এবং 'কেহ আসিলে আমার সঙ্গে দেখা হইবে না', এই কথা বলিতে বলিয়া দিলেন।

খানসামারা আর ঘরে ঢুকিল না।

ব্যানার্জ্জি সাহেব ঘরে ঢুকিয়াই তাঁহার রূপার চেইন ও ঘড়ি সম্মুখের একটা টেবিলে রাখিয়া সতীশচন্দ্রকে বলিলেন, "আপনাকে ধন্যবাদ! আপনি যদি দয়া ক'রে আলোটা নিবিয়ে দেন তবে ভাল হয়। আলো আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না।

সতীশচন্দ্রের মাথায় আবার দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইল। সে আলো নিবাইবার সময় ব্যানার্জ্জি সাহেবের ঘড়ির চেনের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল। ঘর অন্ধকার হওয়ার পরেই সে বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, "ভগবান ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিনে। কে বলে তুমি দীনবন্ধু নও, আজ এই চেন ছড়াটা বেচিলেই কিছুদিনের জন্যে আমাদের সংসার চলে যাবে।"

ব্যানার্জ্জি সাহেব আসিয়াই একখানা ইজি চেয়ারে শুইয়া পড়িয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র আলো নিবাইয়াই তাঁহাকে ডাকিল, ব্যানার্জ্জি সাহেব কোন উত্তর দিলেন না। গায়ে হাত দিয়া সতীশ ঠেলিয়া দেখিল, ব্যানার্জ্জি সাহেবের খুব জোরে নিঃশ্বাস পড়িতেছে এবং তিনি একটু ঘুমাইয়াও পড়িয়াছেন।

সতীশ আর কালবিলম্ব করিল না, ক্ষিপ্রহস্তে সোনার চেইন ও ঘড়ি টেবিল হইতে তুলিয়া লইল। কিন্তু সেগুলি পকেটে রাখিবার সময় তাহার দরখাস্তখানা ঘরের মেজেতে পড়িয়া গেল। সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইবার সময় খানসামাদের

বলিয়া গেল, 'সাহেব ঘুমাচ্ছেন উঁহাকে ব্যস্ত ক'রো না। আমি কাপড় ছেড়েই আসছি'।

রাস্তায় বাহির হইয়াই সতীশ বেগে চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কমলার কাছে কি করিয়া মুখ দেখাইবে ?তাহা ভাবিয়াও সে চমকিতেছিল। এই কয় ঘণ্টার মধ্যেই তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, স্বভাব যেন অনেকটা চোরের মত হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তায় যাহাকে দেখিতেছে তাহাকেই মনে করিতেছে,—লোকটি বুঝি আমায় সন্দেহ করিতেছে।

৫

ভবানীপুরে সতীশচন্দ্রের বাসা। সে বালীগঞ্জ হইতে যখন ভবানীপুরে পৌঁছিল, তখন রাত্রি সাড়ে আটটা। বাসায় যাইবার আগেই সে পাড়ার সুদ-খোর রামধন বিশ্বাসের বাড়ীতে গিয়া বলিল, 'বিশ্বাস দাদা, বড় বিপদে পড়ে এসেছি, জান ত ভাই আমার চাকরী গেছে। আর ধার ক'রে চলে না ; শুধু হাতে আর কত ধার করি ! এই চেন ছড়াটা বাঁধা রেখে ১০০৲ টাকা আমাকে দিতে পার ?'

রামধন বিশ্বাস পাকা লোক। সে বলিল, 'একশ' টাকা ত হবে না, মেরে কেটে আশি টাকা হতে পারে। নাও ত ব'ল এনে দিই।'

সতীশচন্দ্র ৮০৲ টাকাই লইতে সম্মত হইল। রামধন বিশ্বাস চেন রাখিয়া ৮০৲ টাকা আনিয়া দিল। সতীশচন্দ্র সোনার ঘড়িটা চেন হইতে খুলিয়া পকেটে রাখিল। তারপর এক টাকার খাবার কিনিয়া লইয়া বাসায় ঢুকিল।

বাড়ীতে গিয়া দেখিল কমলা ও হরিহর দাওয়ায় বসিয়া আছে। শিশু পুত্রটী মায়ের পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সতীশচন্দ্রকে দেখিয়া হরিহর বলিল, "দাদা আজ এত দেরী হ'ল কেন ? কাজ বুঝি হয়েছে ?"

সতীশ বলিল, "না ভাই কাজ হয় নি। তবে আজ দালালী ক'রে গোটাকতক টাকা নিয়ে এসেছি। অনেকক্ষণ খাটতে হয়েছে, তাই এত দেরী হল."

কমলা বলিল,—এত খাবার পেলে কোথায় ?

সতীশ মুখ তুলিয়া কমলার দিকে চাহিতে পারিল না। সে বলিল, 'যাদের কাজ করে দিইছি, তারাই খাবার দিয়েছে।'

কমলা আর কিছু বলিল না, সতীশ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া ব্যানার্জ্জি সাহেবের নস্যদানী ও ঘড়িটা এবং ৭৯৲ টাকা রাখিয়া দিল। সেই সঙ্গে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া রাখিল—প্রথম দিনে অধর্ম্মের রাস্তায় পা দিতে

না দিতে নগদ আশি টাকা, সোনার নস্যদানী ও ঘড়ি উপার্জ্জন! রামধন বিশ্বাসের কাছে “চেন রেখে ৮০৲ টাকা অদ্য লইলাম।” কাগজের টুকরাও ড্রয়ারে রাখিয়া দিল।

সতীশচন্দ্র তারপর ঘর হইতে বাহির হইয়া কমলার হাতে ১৯৲টী টাকা দিয়া বলিল, আজ এই ১৯৲টী টাকা পেয়েছি কাল বোধ হয় বাকী টাকাটা পাব। তাও বোধ হয় ১৯।২০৲ টাকা হতে পারে। এই রকম আর দু'একটা কাজ পেলেই দেনাগুলো সব ক্রমে ক্রমে শোধ হয়ে যাবে।”

কমলা টাকা কয়টী আচলে বাঁধিয়া স্বামীর জন্য আসন পাতিতে গেল। সতীশচন্দ্র বলিল, “দেথ আজ আর আমি থাব না, অবেলায় থাবার থেয়ে আর খিদে নেই। ভগবান যেমন আজ কষ্ট দিয়েছেন তেমনই টাকাও দিয়েছেন। তোমরা সব খেয়ে নাও। আমি কাল ভোর বেলাতেই বেড়িয়ে যাব আর দশটার মধ্যে ফিরে আসব।”

কমলা বলিল, “কিছু না থাও একটা মিষ্টি থেয়ে জল থাও।”

সতীশ তাহাই করিল।

তৎপর দিন ভোর বেলা সতীশচন্দ্র বাড়ী হইতে বাহির হইল এবং দশটার মধ্যে ঘুরিয়া আসিয়া দেখিল, কমলা তখনও রান্না করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি তৈল ও গামছা দিতে বলিয়া ঘরে ঢুকিল এবং কমলার অজ্ঞাতসারে ড্রয়ার খুলিয়া ১০৲ টাকার দুইখানি নোট বাহির করিয়া আনিল। তারপর নোট দুইখানা কমলার হাতে দিয়া তেল মাখিতে বসিল। কমলা নোট দুইখানি হাতে পাইয়া বলিল, “এইবার সব খুচরা দেনাপত্র শোধ হয়ে যাবে। বাড়ী ভাড়া ও নগদ দেনা পড়ে থাক্‌বে।”

সতীশচন্দ্র বলিল, “তাও বোধ করি বেশী দিন থাক্‌বে না, কাল পরশুর মধ্যে আরও এই রকম একটা কাজ পাব।”

সে কথা শুনিয়া কমলার মুখ হাস্যোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

তারপর সতীশচন্দ্র ভাত থাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

৬

দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর কমলা স্বামীর টেবিলের ড্রয়ারটা অভ্যাস-বশে খুলিতে যাইয়া দেখিল, উহাতে চাবি বন্ধ। সে ভাবিল, কোন কালে ইহাতে চাবি দেওয়া থাকে না, আজ কেন ইহা বন্ধ? তথনই স্ত্রী-সুলভ কৌতূহল আসিয়া তাহার ঘাড়ে চাপিল। সে একতাড়া চাবি আনিয়া অনেক কষ্টে ড্রয়ার খুলিয়া

ফেলিল। ড্রয়ারের মধ্যে যাহা দেখিল তাহাতে সে অবাক্ হইয়া গেল। একটা পাথর-বসান সোণার নস্যদানী, একটা সোণার ঘড়ি, ৪ খানা দশ টাকার নোট আর নোটের উপর সেই কাগজের টুকরাটুকু।

কমলা কয়দিন থেকেই স্বামীর মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, আর মনে মনে সন্দেহ করিতেছিল,—তাহার স্বামী যেন অসৎ উপায়ে পয়সা উপায় করিতেছেন। আজ কাগজের টুক্‌রাটা পড়িয়া সে সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। কমলা অস্ফুটস্বরে "কি সর্ব্বনাশ" বলিয়া বসিয়া পড়িল।

বৈকালে হরিহর স্কুল হইতে বাটীতে আসিয়া যখন জলখাবার খাইতেছিল, তখন কমলা তাহাকে বলিল, "দেখ ঠাকুরপো আমাদের একটা ভারি বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তোমার দাদার——"

এমন সময় একজন লোক "সতীশবাবু বাড়ী আছেন" বলিয়া ডাকিল। হরিহর বাহিরে গিয়া বলিল, "বাড়ী নাই।" লোকটী বলিল, "কখন আস্‌বেন বল্‌তে পার ?" হরিহর বলিল, "তা জানিনে। মশায়ের নাম কি, বলে যান্ এলে বল্‌ব।"

আগন্তুক বলিল, "সতীশ বাবুকে বল্‌বে ব্যানার্জি সাহেবের চেন ও ঘড়ীটা যা তিনি রাখ্‌তে দিয়েছিলেন, তা যেন দিয়ে আসেন।" এই বলিয়া লোকটী চলিয়া গেল।

হরিহর আসিয়া লোকটী যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছিল বৌদিদিকে সে সব কথা বলিল।

কমলা শুনিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছিল, কমলার বুঝিতে তাহা বাকী রহিল না। নস্যদানার এবং ঘড়ির ঢাকনার ভিতর পিঠে "সি, ব্যানার্জ্জি, ১২ নং বালীগঞ্জ রোড" লেখা ছিল। জিনিষ যে কাহার কমলা তাহাও বুঝিতে পারিল। স্বামীর দুই দিনে চালচলন দেখিয়া সে বেশ বুঝিয়াছিল স্বামী ইহা আত্মসাৎ করিয়াছেন। কমলা সঙ্কল্প করিল, আমাদের জন্য স্বামী এমন অধঃপাতে যাইবেন, স্বভাব নষ্ট করিবেন, ইহা চোখের সম্মুখে দেখিতে পারিব না। যেমন করিয়াই হউক, এ পথ হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হইবে।

কমলা 'ড্রয়ার' খুলিয়া নস্যদানী ও ঘড়ি বাহির করিল এবং লক্ষ্মীর হাঁড়ি হইতে ৫টী আকবরী মোহর বাহির করিয়া আনিল। তারপর হরিহরকে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া বলিল, 'ঠাকুর পো তুমি বিশ্বাস মশায়ের স্ত্রীর কাছে আমার নাম ক'রে

বল’ গে, এই আক্‌বরী মোহর পাঁচটী রেখে আমাদের চেন ছড়াটা ফিরিয়ে দিতে। পরশু দিন রাত্রিতে বিশ্বাস মশায়ের কাছে উহা তোমার দাদা বাঁধা রেখে এসেছেন। তারপর চেন ছড়াটা নিয়ে আর এই দুটো টাকা তোমাকে দিলাম—এই দুটো নিয়ে তুমি গাড়ী ভাড়া ক’রে বরাবর সি. ব্যানার্জ্জির ঠিকানায় চলে যাও। সেখানে গিয়ে সকল কথা বুঝিয়ে ব’লে তাঁর জিনিস তিনটে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে এস। আর ব’লে এস, আপনার জিনিস আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম, আপনি আমার দাদাকে পুলিশে দেবেন না।”

হরিহর নিতান্ত বোকা ছেলে নয়। সে বৌদিদির কথামত সমস্ত কার্য্যই ঠিক ঠিক করিল। ব্যানার্জ্জি সাহেব গম্ভীরভাবে জিনিষ তিনটী ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, “সতীশবাবুর স্ত্রীকে বল্‌বে, তিনি আমার কন্যার মত, আমি তাঁর স্বামীর কোন অনিষ্ট কর্‌ব না।” তারপর তিনি হরিহরকে বলিলেন, “পরশু দিন বেলা ৯টার সময় তুমি একবার আমার অফিসে এস; সেদিন তোমাদের জন্যে কিছু সাহায্য কর্‌তে পারি কিনা দেখ্‌ব।”

কমলা হরিহরের জন্য উৎকন্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময়ে হরিহর কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং বৌদিদিকে সমস্ত কথা জানাইল। বৌদিদি বলিলেন, ‘ভাই পরশু দিন তা’ হ’লে যেও।”

তারপর দিন সকাল বেলা সতীশচন্দ্র যখন বাটী হইতে বাহির হইতেছিল, তখন রায়-ব্যানার্জ্জির মুদ্রিত খামে করিয়া তাহার নামে এক পত্র আসিল। খাম ছিঁড়িয়া সতীশ দেখিল, ব্যানার্জ্জি সাহেব তাহাকে তাঁহার আফিসে ঐ দিনই বেলা ১১ টার সময় দেখা করিতে বলিয়াছেন। সতীশচন্দ্র যাইব কিনা ভাবিতেছিলেন; তাহার মনে ভয় হইতেছিল, যদি ধরাইয়া দেয়। কিন্তু যখন দেখিল, অফিস হইতে চাকুরীর জন্য চিঠি লেখা, তখন তাহার ভয় দূর হইল। যে ঠিক সময়ে স্নান আহার করিয়া রায়-ব্যানার্জ্জির অফিসে উপস্থিত হইল। ব্যানার্জ্জি সাহেব তাহাকে ঘরে ডাকিলেন এবং বলিলেন, “তুমি আমার টেবিলে বসে একখানা চিঠি লেখ দেখি। তোমার হাতের লেখাটা আমি একবার দেখ্‌ব।” ব্যানার্জ্জি সাহেবের কথায় সতীশ একখানি পত্র লিখিল। বলা বাহুল্য, সতীশের হস্তাক্ষর পরিষ্কার ছিল। ব্যানার্জ্জি সাহেব বলিলেন, “কাল তুমি ঠিক সাড়ে নয়টার সময় এস, তোমার সার্টিফিকেট নিয়ে এস—আমি তোমাকে আমার প্রাইভেট ক্লার্কের পদে নিযুক্ত কর্‌ব।”

৮

এদিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে হরিহর রায়-ব্যানার্জ্জির অফিসে গিয়া পৌছিল এবং দেখিল

সাহেব ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন। হরিহরকে দেখিয়া ব্যানার্জ্জি সাহেব বলিলেন, "দেখ বাবা তুমি এই পর্দ্দার আড়ালে বসে থাক। সময় হলেই আমি তোমায় ডাক্‌ব।"

হরিহর আসিবার আধ ঘণ্টা পরেই সতীশচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই ব্যানার্জ্জি সাহেব বলিলেন, "তুমি বড় কাঁচা কাজ কর। এই দেখ যখন তুমি এই জিনিষগুলি (নস্যদানী, চেন ও ঘড়ি) নিয়ে যাও, তখন ভুল ক'রে তুমি তোমার এই দরখাস্তখানা (দরখাস্ত প্রদর্শন) ঘরের মেজেতে ফেলে গিয়েছিলে। অন্য কেউ হ'লে পুলিশে দিত। আমি তোমার অবস্থা সব শুনেছি।"

ব্যানার্জ্জি সাহেবের কথা শুনিয়া এবং নস্যদানী, চেন ও ঘড়ি দেখিয়া সতীশচন্দ্রের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। ব্যানার্জ্জি সাহেব বলিলেন, "তোমার ভয় নেই। কাল থেকে তুমি আমার বাড়ীতে ৬০৲ টাকা বেতনে আমার নিজস্ব কেরাণী নিযুক্ত হ'লে। ভাল ক'রে কাজ-কর্ম্ম কর্‌লে পরে বেতন আরও বাড়িয়ে দেব। দেখ তুমি যে আমার জীবন রক্ষা করেছিলে, এই তার সামান্য প্রতিদান।"

এই কথা বলিয়াই ব্যানার্জ্জি সাহেব পর্দ্দা সরাইয়া দিলেন। সতীশচন্দ্র সবিস্ময়ে দেখিল, হরিহর! হরিহর ছুটিয়া আসিয়া দাদার গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং ক্ষণেকের জন্য ভুলিয়া গেল যে, তাহারা অপরের জায়গায় দাঁড়াইয়া আছে। সজলনয়নে হরিহর বলিতে লাগিল, "দাদা! বৌদিদি অনুমান ক'রে আর তোমার হাব-ভাব দেখে তুমি অসৎ উপায়ে টাকা এনেছিলে ব'লে তোমায় সন্দেহ করেছিলেন। তারপর ড্রয়ার খুলে দেখতেই তাঁর সন্দেহ আর অনুমান সত্য হ'য়ে দাঁড়াল। এক টুক্‌রো কাগজে রামধন বিশ্বাসের নাম ও চেন বাঁধা রাখার কথাও জান্‌তে পারা গেল। তারপর তোমার সঙ্গে যে আকবরী মোহর বেচবার কথা নিয়ে বৌদিদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল সেই মোহর পাঁচটা দিয়ে বৌদিদির কথায় আমি চেন ছাড়িয়ে নিয়ে আসি এবং নস্যদানী, ঘড়ি ও চেন এনে ব্যানার্জ্জি সাহেবকে ফিরিয়ে দিই।"

হরিহরের কথা শুনিয়াই সতীশচন্দ্র তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সহসা ব্যানার্জ্জি সাহেবের কণ্ঠস্বরে তাহাদের চমক ভাঙ্গিল। ব্যানার্জ্জি সাহেব বলিলেন, "সতীশ এই একশ টাকা নিয়ে যাও, লক্ষ্মীর হাঁড়ির মোহর কটা ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেও। এই বলিয়া ব্যানার্জ্জি সাহেব বাহিরে আসিলেন। সতীশ ও হরিহর তাঁহার পিছনে পিছনে আসিল। ব্যানার্জ্জি সাহেব তাহাদের দিকে চাহিয়া "আমি চল্লুম" বলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সতীশ ও হরিহর বাড়ীর দিকে চলিল।

সতীশ ও হরিহর যখন বাড়ীতে ফিরিল, তখন কমলা বঁটিতে তরকারী কুটিতে-ছিল। সতীশচন্দ্র আসিয়া তাহাকে বলিল, "কমলা এই ত তুমি মোহর বাঁধা দিয়েছ; তবে আমার কথায় দাও নাই কেন?"

কমলা বলিল,—"তখন ত আর বংশের গৌরব নষ্ট হয় নি। ধার হ'লে মানুষ ধার শোধ করতে পারে, কিন্তু বংশের গৌরব একবার নষ্ট হ'লে আর ফেরে না। মা যখন মারা যান, তখন আমায় বলে গিয়েছিলেন, বংশের গৌরব যেতে বস্‌লে তুমি মোহর কটা নষ্ট ক'র, নইলে উহাতে হাত দিও না। আমি মার কথাই রক্ষে করেছি। তুমি যে কাজ করেছিলে তাতে বংশের গৌরব নষ্ট হতে বসেছিল, আমি মোহর বাঁধা দিয়ে সেই গৌরব ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি।"

সতীশচন্দ্র বলিল, "তবে সে গৌরবের জিনিস আর পরের ঘরে থাকে কেন? ব্যানার্জ্জি সাহেব এই টাকা দিয়েছেন, সে গুলো ফিরিয়ে এনো।

কমলা অত্যধিক আনন্দের আবেগে বঁটিতে হাত কাটিয়া ফেলিল।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

বাঙ্গালীর দৈহিক বলের প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালী দুর্ব্বল,—এ অখ্যাতি বাঙ্গালীজাতির স্কন্ধে কতদিন হইতে আরোপিত হইয়াছে, তাহা জানি না। যে ইতিহাসকার মাত্র সপ্তদশজন অশ্বারোহী সৈনিকের সহায়তায় বাঙ্গালা-জয়ের বিবরণ জনসমাজে প্রচারিত করিয়াছিলেন, তিনি বা তাঁহার পূর্ব্বের আর কোন শক্তিধর এ কথার প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। অনুসন্ধিৎসু প্রত্ন-তাত্ত্বিকেরা আমাদের এ সংশয়ের উচ্ছেদ-সাধন করিতে পারেন। 'বাঙ্গালী দুর্ব্বল' 'বাঙ্গালী কাপুরুষ' এই অখ্যাতি, এই উক্তি বাঙ্গালীর চরিত্রের সহিত যেন সত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উহা এমন ভাবে বাঙ্গালীর দেহ ও মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে যে, বাঙ্গালী মনে করিতে পারে না,—সে দুর্ব্বল ও কাপুরুষ নহে। আশ্চর্য্য বটে!

* * *

ঐতিহাসিক সত্য অনেক সময়ে কিম্বদন্তী ও প্রবাদ-বচনের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া থাকে। পুরাতন গল্প-কাহিনী এবং পিতামহীর গল্পের ভিতর দিয়াও ইতিহাসের সত্য ঘটনা যে 'উঁকি' মারে না, এমন কথা বলা যায়

না। সেকালের বাঙ্গালীরা যে যথেষ্ট খাইতে পারিত, দশ বিশ ক্রোশ হাঁটিতে পারিত, লাঠি ধরিতে পারিত, দস্যু-তস্করের সহিত যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ ছিল না, এরূপ গল্প এখনও প্রাচীন লোকদিগের সহিত কথোপকথনের সময় শুনিতে পাওয়া যায়। লর্ড মেকলের উক্তিতে 'অন্ধবিশ্বাস' করিয়া যদি মনে করা যায়, বাঙ্গালীর কথা সত্য নহে, তাহা হইলেও আপনাদের চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। অনেক বৃদ্ধ বাঙ্গালীকে আমরা দেখিয়াছি, যাঁহাদের স্বাস্থ্য একালের যুবকদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল; শুধু তাহাই নহে; তাঁহাদের শ্রমপটুতা ও দৈহিক শক্তিও অনেক অধিক এবং হস্তপদের অস্থি পর্য্যন্ত এখনকার পূর্ণবয়স্ক যুবকদিগের অপেক্ষা বহু গুণে কঠিন ও স্থূল। চক্ষুর জ্যোতিঃ ও পরিপাকের ক্ষমতা যুবকদিগের অপেক্ষা বৃদ্ধদিগের অনেক বেশী।

* * *

তার পর আর একটা কথা আছে। সেকালে বাঙ্গালীর খাবার জিনিষে ভেজাল ছিল না। একালে বাঙ্গালীর খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশিয়াছে। ঘৃত তৈল, দুগ্ধ, চাউল, ময়দা, চিনি—সমুদয় দ্রব্যেই ভেজাল। ভেজাল খাইয়া যে এ যুগের বাঙ্গালী সে যুগের বাঙ্গালী অপেক্ষা দৈহিক বলে অধিকতর সৌভাগ্যশালী হইবে, এমন ত মনে হয় না। এখনকার ভেজাল-ভোজী ম্যালেরিয়া-পীড়িত বাঙ্গালীর জীর্ণ শীর্ণ শরীর দেখিয়া বাঙ্গালীকে বরং দুর্ব্বল, রুগ্ন, মুমূর্ষু বলিতে পার, কিন্তু তখনকার বাঙ্গালীকে এ অপবাদ দেওয়া চলিতে পারে না।

* * *

বেশী দূরে যাইতে হইবে না,—রাজা রামমোহন যে পরিমাণ আহার করিতেন, এ যুগের বাঙ্গালীরা তেমন খাইতে পারেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া বীরসিংহগ্রামে যাইতেন—এত দুই চারি ক্রোশ রাস্তা নয়, বিশ পঁচিশ ক্রোশ রাস্তা! পথে কখনও কখনও নদীও সাঁতার দিয়া পার হইতে হইত। কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ প্রাচীন ও নূতন যুগের সন্ধিক্ষণের লোক। তিনি কিরূপ আহার ও পরিশ্রম করিতে পারেন তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। শুনিতে পাই, রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ও খুব আহার করিতে পারিতেন। যেমন আহার, দেহের শক্তিও তাঁহাদের তেমনই ছিল।

*　　*　　*

এ সকল ব্যতীত গল্প-কাহিনীতে এবং লোকের মুখে মুখে বাঙ্গালীর দৈহিক শক্তির প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলিতে অতিরঞ্জন থাকা অসম্ভব নহে, কিন্তু মিথ্যা বলিয়া সেগুলিকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। "আধমণি" কৈলাস নামক এক ব্যক্তির কথা এখনও অনেকের মুখে শুনা যায়, সে ব্যক্তি একাসনে বসিয়া অর্দ্ধমণ দ্রব্য খাইতে পারিত। 'আধমণি' কৈলাস কলিকাতাতেই থাকিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কারণ, কলিকাতার বাহিরে তাহার কথা বড় একটা শুনা যায় না।

*　　*　　*

"হিন্দুপেট্রিয়টে"র সম্পাদক বলিয়াছেন যে, কলিকাতার আহিরীটোলা অঞ্চলে চৌদ্দভূষণ ভট্টাচার্য্য ও মহেশ হালদার উভয়েরই আহার করিবার বিলক্ষণ শক্তি ছিল। ইঁহারা দুইজনে ৫০ বৎসর আগেকার লোক। চৌদ্দভূষণ যে কোন খাদ্যদ্রব্য চৌদ্দ গণ্ডা খাইতে পারিতেন। এজন্য তাঁহার নাম চৌদ্দভূষণ হইয়াছিল। মহেশ হালদার একদিন শোভাবাজারের রাজবাটীতে রাজা রাজকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হন। তাঁহার আহারের শক্তি দেখিয়া রাজা বাহাদুর জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি প্রত্যহ বাড়ী-তেও এইরূপ আহার করেন?" মহেশ হালদার উত্তর করেন, "না, অভা-বের জন্য উদর পূরিয়া খাইতে পাই না।" রাজা রাজকৃষ্ণ তাঁহাকে পেট ভরিয়া আহার করিবার জন্য একখণ্ড ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রদান করেন।

*　　*　　*

দৈহিক শক্তির পরিচয় আশানন্দ ঢেঁকির গল্পে অনেক পাওয়া যায়। আশানন্দ ঢেঁকি একবার ঢেঁকি ঘুরাইয়া ডাকাতদিগকে আক্রমণ করিয়া-ছিলেন। তদবধি তাঁহার নাম হয়, আশানন্দ ঢেঁকি। যে ব্যক্তি ঢেঁকি লইয়া ডাকাতদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহার দেহের বল কিরূপ, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। বর্দ্ধমানের রামদাস, নদীয়ার আশানন্দ ঢেঁকি, কলিকাতার লাটুবাবু প্রভৃতির দৈহিক বল অমানুষিক ছিল।

*　　*　　*

ইঁহাদের কথা ব্যক্তিগত বলিয়া ছাড়িয়া দিলেও বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক জমীদার ও সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে যে সকল লাঠিয়াল ও পালোয়ান নিযুক্ত

থাকিত, তাহাদের অধিকাংশেরই দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য যথেষ্ট ছিল। উহারা "রণ-পা" পায়ে দিয়া এক রাত্রির মধ্যে বিশ ত্রিশ ক্রোশ চলিয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিত। একাকী লাঠি খেলিয়া দশ বিশ জন শত্রুকে তাড়াইতে পারিত। সন্তরণে নদী পার হইতে পারিত। অরাজকতার দিনে, দস্যু-তস্কর-পরিপূরিত যুগে লাঠির বলে এবং শরীরের সামর্থ্যে একাকীই প্রভুর বাটী রক্ষা করিত। এখনও বাঙ্গালার বনিয়াদী জমিদার-দিগের বাটীতে যাইলে এমন সকল লোকের দৈহিক শক্তির ও সাহসের অনেক কথা শুনা যায়। এ সকল ত অবিশ্বাস করা যায় না।

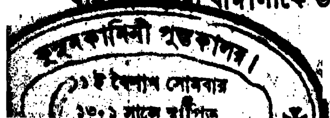
* * *

প্রসিদ্ধ বীর বাঙ্গালী-কুল-কলঙ্ক কালাপাহাড় এবং সীতারামের প্রধান সেনাপতি সেনাহাতির দৈহিক বলের কাহিনী এখনও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্য, সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি মোহনলালও দৈহিক বলে যথেষ্ট বলীয়ান্ ছিলেন।

* * *

সুতরাং বাঙ্গালী যে দুর্ব্বল, এ কথা কোন ঐতিহাসিকের ইচ্ছাকৃত 'নষ্টামি' বা সরল ভ্রম বলিয়া আমরা উপেক্ষা করিতে পারি। বাঙ্গালী কোন কালে দুর্ব্বল ছিল না, আজও বাঙ্গালীর ছেলেরা দুর্ব্বল নহে। আজকালকার দুর্ব্বলতাকে ভেজাল খাদ্যদ্রব্য-ভোজনের ফল বরং বলিও; কিন্তু কাপুরুষ বলিয়া আপনাদিগকে আপনারা বৃথা গালি দিও না। যাহারা দামোদর ও কাঁথির বন্যায় বীরের মত আত্মত্যাগ করিয়া পর-সেবা করিয়া আসিয়াছে; যাহারা গঙ্গাসাগরে শত বিপদের মাঝে যাত্রীর সেবা করিতে গিয়াছে; আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া জলমগ্নপ্রায় ব্যক্তির উদ্ধার-সাধন করিয়াছে; যাহারা অর্দ্ধোদয় যোগের সময় বীরের মত আপনাদের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরের জন্য খাটিয়াছে, আর আজ রাজার কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিবার জন্য, বাঙ্গালার সেবাধর্ম্মকে জগৎ-সমক্ষে প্রস্ফুট করিবার জন্য সমর-ক্ষেত্রের অনল-বৃষ্টির মাঝে যাহারা জীবন-দান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই বাঙ্গালীর সন্তান, বাঙ্গালীর ছেলে; তাহারা কোন দেশের, কোন জাতির সাহসী ছেলেদের চেয়ে সাহসে বীর্য্যে আত্মত্যাগে ন্যূন নহে। বাঙ্গালীকে অন্য সকল গালি দিতে পার, কিন্তু বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীকে ভীরু, দুর্ব্বল বলিও না।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।


কুসুমকামিনী পুস্তকালয়
১১ই বৈশাখ সোমবার
১৩০১ সালে স্থাপিত